• উপন্যাস

বাতাসবাড়ি জ্যোৎস্নাবাড়ি

অমর মিত্র

‘সকালে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পশ্চিম মুখেই হাঁটি। রাঢ় দেশের বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে। রাঙা বালি, দিগন্তে তালবনের সারি। হয়তো মাঠের মাঝে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড দিঘি, তালবনে ঘেরা কি ফাঁকা জায়গা এ-সব! মনে হতো যেন সীমাহারা দিক সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে চলেছি, কোন অজ্ঞাত দিগন্তের বননীল উপকূলে গিয়ে ভিড়ব...’

বিভূতিভূষণের দৃষ্টিপ্রদীপ পড়তে পড়তে অনুপম ফোন পেলেন। বেজে বেজে থেমে গেল। অনেক পরে দেখলেন, তাঁর পুত্র টুটুলের কলকাতার কলিগ আভাসের ফোন। আগড়ুম বাগড়ুম বকে। কেমন আছেন তিনি, শরীর কেমন, প্রেশার কত, সুগার...এই সব ফালতু খোঁজ নেয়। তিনি বইটি রাখলেন। কতবার পড়া, তবু ঘুরে ফিরে এক এক অংশ পড়েন। টুটুল সারা কলকাতায় যেন ওয়াচ ম্যান রেখে দিয়েছে, বিরক্ত লাগে। এক একদিন এই আভাস বলে, সে অমুক দিন আসবে। তিনি বলেন, সেদিন তিনি থাকবেন না।

টুটুল যে বছর জন্মায় সে বছর খুব বৃষ্টি। পাঁচদিন ধরে অবিশ্রান্ত। টুটুল—সূর্যনীল এখন চৌত্রিশ। তাঁদের

প্রথম সন্তান। জন্মেছিল মে মাসে। বৃষ্টিও সেই মে মাসে। মেঘ ভেঙে পড়েছিল আচমকা। তখন তাঁরা থাকেন মেদিনীপুর শহরে। মিশন কম্পাউন্ডে। অমল সেনগুপ্তর বাড়ি। বৃদ্ধ বৃদ্ধা থাকতেন দোতলায়, তাঁরা একতলায়। অমল সেনগুপ্ত এবং ইতি সেনগুপ্তর দুটি সন্তান। দু'জনেই বাইরে। দিল্লি এবং মালদা। খুব কম আসে। অমল পেনশনভোগী। তাঁর স্ত্রীও তাই। গান শুনতে ভালোবাসতেন। রেকর্ড ছিল অনেক। অনুপমের মনে পড়ে সব। সে আর কুন্তলা উপরে উঠে যেত গান শুনতে। লং প্লেয়িং রেকর্ডে হেমন্ত, শচীন দেববর্মণ, লতা, সন্ধ্যা, বেগম আখতার, জোছনা করেছে আড়ি...। তখন টেপ রেকর্ডার আসছে সবে। ক্যাসেট ধীরে ধীরে সরিয়ে দিচ্ছে ৭৮, ৪৫ এবং ৩৩ আরপিএম রেকর্ড। কিন্তু তাঁরা রেকর্ড ছাড়া কিছু বুঝতেন না। তাঁদের গ্রামোফোন ছিল হল্যান্ডের ফিলিপস কোম্পানির। সোনালি চোঙা লাগানো। মনে পড়ে অনুপমের। তাঁদের গান শুনতে ডাকতেন অমল আর ইতি। বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা, দূর নীলিমায় ওঠে চাঁদ বাঁকা... চমৎকার সাজানো বাড়ি। গেটে দুটি দেবদারু গাছ। জানালা দিয়ে চাঁদ দেখা যেত। পূর্ণিমায় অতি বৃহৎ সোনার থালা। একচিলতে ফুলের বাগান। বাড়ির পেছন দিকে পেয়ারা আর আতা। হাসপাতালে টুটুল হয়েছিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভিতর। সেনগুপ্ত মশায় বলেছিলেন, ছেলের নাম রাখো বর্ষণ।

বর্ষণ! ভারী সুন্দর নাম। অমল সেনগুপ্ত যৌবনে কবিতা লিখতেন। কিন্তু কুন্তলা সেই নাম রাখেনি। বর্ষণ কেন হবে? মানে শুধু কাঁদবে। কিংবা কাঁদাবে। না, অবিরাম বৃষ্টিপাতের স্মৃতি ওর নামে থাকবে না। সেই টুটুল এখন বিদেশে। কুন্তলা চলে গেছে। অনুপম এখন একা। অনুপম কাজরী শোনেন এক একদিন ইউটিউবে। গিরিজা দেবী আর রবি কিচলু, বর্ষণ লাগি বাদরিয়া রুমঝুমকে ...। টুটুলের পর অনুপমের এক মেয়ে। সে হয়েছিল বছর তিন বাদে। তখন ছিল শীত। টুটুলের নাম সূর্য। বুবুলের নাম বিদিশা। বিদিশা এক প্রাচীন নগরের নাম। অনুপম এখন তাঁর ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে। মর্নিংওয়াক সেরে ফিরেছেন। মর্নিংওয়াক করে, বাজার সেরে, দুধ নিয়ে ফিরতে তাঁর আটটা হয়ে যায়। বের হয় সাড়ে পাঁচটায়। ওঠে পাঁচটায়। সকাল পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা, এই আধ ঘণ্টা খুব দ্রুততায় সব কাজ করে অনুপম। ঘুম ভাঙার পর ৩০-৩৫ মিনিট খুব তাড়াতাড়ি সব করতে হয়। মনে হয় এখনই ছটা বেজে যাবে। ছটা বেজে গেলে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাবে। সমস্ত দিন যায় বিলম্বিত লয়ে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, কিন্তু ওই তিরিশ পঁয়তিরিশ মিনিট যেন এই এতটা জীবনের মতো। কী করে যে সব হয়ে গেল। কাজ শেষ। এখন অপেক্ষা। জীবন আরম্ভ কবে হল, কোন ফাঁকে জীবন এতটা বয়ে গেল, ধরাই গেল না। তিরিশ থেকে পঁয়তিরিশ মিনিট। ব্রাশ করতে করতে চা বসান। ব্রাশ শেষ করে লিকার চা আর দুটি বিস্কুট। তার আগে এক গ্লাস জল। সেই জলে সারারাত একটি তুলসীপাতা ভেজে। এই অভ্যাসটি বাবার কাছ থেকে পাওয়া। চা শেষ করে টয়লেট শেষ করে বেরিয়ে পড়া। হাতে থলেটি থাকে। থাকে থাকুক। থাকলে কী হয়েছে। বাজার করে ফিরবে। সকাল সাড়ে পাঁচটায় জুনের আরম্ভে রোদ উঠে যায়। পৌনে ছটায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় অনীশের। অনীশ রায়। সে আসে বেলগাছিয়ার দিক থেকে। তাঁর কলিগ ছিল। এখন সকালের সঙ্গী। অনীশের পর সসীম পাল। রুনা, জয়দেববাবু, প্রাক্তন এমএলএ জিতেন তেওয়ারি, হরিশ মুখুটি...পরপর দেখা হতেই থাকে। এইটুকুই মেলামেশা। তারপর তো একা। অনুপম জানেন, ওই পঁয়তিরিশ মিনিট এদিক-ওদিক হলে, যার সঙ্গে যেখানে দেখা হওয়ার কথা, তা হবে না। হয়তো চিনিকে নিয়ে হাঁটা দেবে টেকো লোকটা। রতন শেঠ। বলে জগৎ শেঠের বংশধর। বলে বুক চিতোয়। বার্নপুর ইস্পাত কারখানায় কাজ করত। অবসরের পর এদিকে ফ্ল্যাট কিনে এসেছে। লোকটার নজর পড়েছে চিনির দিকে। সসীমের স্ত্রীকে কী বলেছে তার নামে, সসীম লোকটার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। চিনিকে নিয়েই হয়তো। চিনি একা থাকে। বাবার পেনশন পায়। জমানো টাকাও আছে। বছর তেত্রিশ-চৌত্রিশ। গুরু নামে সকল মুক্তি, আধ্যাত্মিকতা নিয়েই তার গুনগুন। অদ্ভুত মেয়ে। বাবা, মা, দিদির মৃত্যু দেখেছে চোখের সামনে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি। মুখভরা হাসি। সারাদিন যে লোকটা একা থাকে তার কাছে সকালের এই সময়টুকু খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি সকালের রুটিন ব্যাহত হয়, খুব মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় বাকি জীবনই বদল হয়ে যাবে। সমস্ত রুটিন ভেঙে যাবে। দিনটা ভালো যাবেই না। অনুপম তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনেছিলেন এমনি একটা দিনেই বোধ হয়। বসিরহাট হাসপাতাল, সেখান থেকে কলকাতা। তারপর মৃত্যু। তাঁর ঘুম ভেঙেছিল সেদিন অনেক দেরিতে।

দরজা খোলা ছিল। টপ ফ্লোরের অবিন এসে ঢুকল, আমি তাহলে যাচ্ছি আঙ্কেল।

এসো। তিনি এগিয়ে গেলেন, কবে ফিরবে?

দিন পনেরো বাদে। অবিন বলল।

তুমি তো পুরুলিয়ায় নিয়েই যেতে পারো ওদের।

পারি, কিন্তু ছেলের পড়া, আর এমন ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবে, এত কম ভাড়ায় পাব এমনি?

অবিন ভাড়ায় আছে। ওর ফ্ল্যাটের মালিক থাকে অসলো, নরওয়েতে। যুক্তি অসত্য নয়, কিন্তু এইভাবে পরিবার ছেড়ে বাইরে থাকাও তো বিড়ম্বনা। এই সাততলা আবাসনে একুশটি ফ্ল্যাট। নীচে গাড়ি রাখার জায়গা। সিকিউরিটি আছে দুজন। পালা করে ডিউটি দেয়। তাদের টাকা দেয় মালিকরা। উনিশটি ফ্ল্যাটে তালা। সিকিউরিটিদের দায়িত্ব সব ফ্ল্যাট পরিদর্শন করে ঠিকঠাক রাখা। আসলে অবিন যদি চলে যায়, অনুপমের খুব খারাপ লাগবে না। এই নিঃঝুম আবাসনে তিনি একা থাকেন, এই বোধই যথেষ্ট।

অবিন আর কথা বাড়ায় না। হয় সে এই আলোচনা করতে চাইছে না, না হয় তার হাতে সময় নেই। কাঁধে ব্যাগ। ট্রেন ধরবে হাওড়া থেকে। এখন কি এইসব আলোচনা করা যায়? অবিন বেশ আছে। মা, ছেলে নিয়ে ওর বউ এই নিঃঝুম আবাসনে থাকে। নিঃঝুম কেন, না অনেক ফ্ল্যাটেই আবাসিকরা নেই। কিনে রেখেছে ফ্ল্যাট। ইনভেস্টমেন্ট। মাঝেমধ্যে এসে দেখে যায়। ভাড়া দিয়েছিল একজন তার ফ্ল্যাট। সব আইটি-র ছাত্র। খুব হল্লা করত রাত্তিরে। তখন অবিনের বাবা বেঁচে। তাদের তুলে দেওয়া হল। তারপরে আর কেউ অমন ভাড়া দেয়নি। আর অনেকেই বিদেশে থাকে। দু'বছরে একবার আসে। অনুপমের ফ্ল্যাট তিনতলায়। ব্যালকনি থেকে অনেকটা দূর দেখা যায়, কারণ রাস্তার ওপারে একটি প্রায় জীর্ণ হয়ে আসা দোতলা বাড়ি। এক বৃদ্ধা থাকেন। তাঁর পুত্র দিল্লিতে। তিনি বসে থাকেন ব্যালকনিতে প্রায় সমস্ত দিন। সঙ্গে একটি মধ্যবয়সিনী থাকে। তাকে রেখে গেছে পুত্র। অনুপমের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। অনুপম এড়িয়েই চলেন। পরিচয় হলে তার উপর দায়িত্ব দিয়ে যাবে দিল্লিবাসী। ভয় আছে।

রান্নার মহিলা এলেন। আনুর মা। আনুর মা খুব তাড়াতাড়ি রান্না করে। অতিরিক্ত হল সপ্তাহে দুদিন আসেন জামাকাপড় ওয়াশিং মেশিনে ধুতে। এরপর আসবে রুকসানা। ঘর পরিষ্কার, বাসন ধোয়াধুয়ি করে চলে যায়। বিকেলে আবার আসে বাসন ধুতে। রাতের রুটি কিনে আনেন অনুপম। বেশ আছেন।

সিউড়ি থেকে মেয়ে বিদিশার ফোন এল, বাবা, কী করছ?

কিছু না তো। অনুপমের মগ্নতা ভেঙে গেল।

একা বসে আছ?

হ্যাঁ, আর কে থাকবে? বিরক্ত হলেন অনুপম, তার মগ্নতা ভেঙে দিল। আসলে তার সন্দেহ আছে। ক'দিন একটি কম বয়সি মেয়ে কাজ করছিল। খুব চটপটে। বুবুল এসেছিল তখন। তাকে ছাড়িয়ে দিল। সেই মেয়েটি ফ্ল্যাট ঝকঝকে করে দিয়ে যেত। তাঁকে পিসেমশায় বলত। মাসখানেকের জন্য বুবুল এসে তার সঙ্গে

খিটিমিটি লাগাল। ছাড়িয়েই দিল। মেয়েটা নিঃশব্দে কাজ করত। দুঃখী ছিল। দুই সন্তান নিয়ে অনাথ। স্বামী আর একটা বিয়ে করেছে। তার জায়গায় রুকসানা মাসি এসে কাজ করছে। বুবুল—বিদিশা কেন এত সন্দেহপ্রবণ হল? তাদের সিউড়িতে এক ভদ্রলোক একা থাকতেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। কাজের মেয়ে তার একটি বাচ্চা নিয়ে সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে উঠে এসেছে। তিনি তাকে নিয়ে আবার সংসার পেতেছেন। জীবন নতুন করে আরম্ভ করেছেন। শোনার পর থেকে বাবাকে লক্ষ রাখে বুবুল। ইউএস থেকে টুটুলের নির্দেশ পেয়েছে হয়তো। টুটুল তাকে ডাকছে। কতবার ডাকছে। বাবা আমার কাছে ছ'মাস থেকে যাও, একা কী করো? অনুপম না করেই যাচ্ছেন। বন্দি হতে যাবেন না। সে দেশে সোম থেকে শুক্র কাজ, শনি রবি ছুটি। ওদের মেয়েকে ক্রেসে রেখে স্বামী-স্ত্রী চাকরিতে যায়। তিনি গিয়ে আটকা থাকতে চান না। পাঁচ দিন সারাদিন একা।

বাবা, ভাবছি, তিন্নির সামার ভ্যাকেশনে তোমাকে এনে রাখব আমার এখানে।

তিন্নি তাঁর দৌহিত্রী। তিন্নির কাছে যেতে ভালোই লাগে। কিন্তু ক'দিন? দিন চারেকের পরই মন যাই যাই করতে থাকে। এই তিনটি শূন্য ঘর, লিভিং স্পেস, শূন্য দোলনা, ইজি চেয়ার, নিঝুম আবাসন, ব্যালকনি, ওপারের বৃদ্ধা, সকালের মানুষগুলি... সব তাকে টানতে থাকে। ক্ষুধিত পাষাণের সেই তুলোর কারবারির মতো। এই আবাসনের বয়স কত হবে? বছর পনেরো। যখন টুটুল চাকরি পেল বি-টেক পাশের পরপর, তার বছর দুইয়ের ভিতর এই ফ্ল্যাট কেনা। তার আগে জেলায় জেলায় ঘুরে কেটেছে। ইংল্যান্ডে থাকতেন এর মালিক। টুটুল বোধ হয় এই দেশে অন্যত্র আর একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। দিল্লি কিংবা মুম্বইয়ে। তিনি ঠিক জানেন না। কৌতূহল নেই। আর ওই দেশে তার নিজস্ব বাংলো। শোনা কথা। সে কুন্তলার অসুখে আসেনি। আসতে পারেনি। কুন্তলা সময়ও দেয়নি। জীবনের আরম্ভে, সেই মিশন কম্পাউন্ডে অমল সেনগুপ্তর বাড়িতে থাকার বছর আট খুব ভালো কেটেছিল, তারপর থেকে সে কম কষ্ট করেনি ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে। বসিরহাট বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে দাঁড়ের মাঠ তাঁদের গ্রাম। সেখান থেকে ওপারে তাঁদের গ্রাম মাইল কুড়ি দূরে। সাতক্ষীরে শহরের মাইল আটেক দূরে বড় গাঙদিয়া। দাঁড়ের মাঠে এখনও ছোট ভাইয়ের পরিবার থাকে। সে নেই। আর তাঁর মা আছেন। মা নব্বই হবেন। মেজভাই বসিরহাট শহরে বাড়ি করেছে নিজের অংশ বিক্রি করে। মাইনের টাকার একটা অংশ বাবা-মাকে পাঠাতে হতো। ছেলে-মেয়ের জন্য ত্যাগ করতে হয়েছিল অনেক ভালো মন্দ। তাদের ভালো ইস্কুলে পড়ানো, টিউশন..., উত্তরবঙ্গে বদলি, আলিপুরদুয়ারে কত কষ্ট করে থাকা, সব মেনে নিয়েছিল কুন্তলা সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়তে। ওদিকে দাঁড়ের মাঠ গ্রামে বাবা, মা, দুই ভাই— সকলে তার দিকে চেয়ে থাকত। কুন্তলা খুব হতাশ হয়েছিল টুটুলের বিদেশ যাত্রায়। ওর বউ সুমনাও কৃতী ছাত্রী। দুজনের কত আয়! তখন অনুপমের সারা বছর যা আয়, ওদের এক মাসের আয় তাই। কিন্তু গেল। কুন্তলার অসুখের চিহ্ন তখন ফুটতে শুরু করেছে। সমস্ত জীবন যে ক্ষয় হয়েছিল গোপনে, তা দেখা দিল টুটুলের বিদেশ যাত্রার পর। ভোগই করতে পারেনি সুখের জীবন, জীবনের সামান্য সুখ, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। সারাজীবন তো অন্যের বাড়িতে ভাড়াটে হয়েই কেটেছে তার। এই ফ্ল্যাট কেনা হয়েছিল তারই কথায়। টুটুল যোগাযোগ করছিল ইংল্যান্ড নিবাসী মালিকের সঙ্গে।

মেয়ে ডাকছে—বাবা, বাবা, কথা বলছ না কেন?

অনুপম বললেন, আমি ওই সময় মেদিনীপুর যাব।

মেদিনীপুর কেন?

শালবনি, ঠিক মেদিনীপুর না।

শালবনি, ওখানে তো খুব গরম এই সময়।

সে তো সিউড়িতেও। তিনি বললেন।

শালবনিতে কী করতে? বিদিশা জিজ্ঞেস করে।

আমার এক বন্ধু অনেক দিন ধরে যেতে বলছে, যাই ঘুরে আসি।

বিদিশা জিজ্ঞেস করে, কে বন্ধু, কী নাম?

অনুপম বললেন, নাম শুনে তোর কী হবে, তুই কি চিনিস?

চিনতেও তো পারি। বিদিশা যেন জেরা করতে থাকে।

না, বিজন সিংহ কে তুই চিনবি কী করে? অনুপম বললেন। বিজন সিংহ কেউ নয়। নামটা এক কল্পিত খুনির। একটা রহস্য উপন্যাসে আছে। গতকালই পড়ছিলেন। বিদিশা বলল, পরে যেও, আমাদের বাড়ি থেকে ঘুরে যেও, তিন্নি শুধু বলে দাদাই কবে আসবে।

যাব, বিজনের বাড়ি ঘুরে আসি, অসুস্থ হয়েছে, ওর ছেলে ফোন করেছিল, বিজন খুব ভালো মানুষ, আমাকে অনেক হেল্প করেছিল মেদিনীপুরে থাকার সময়, সেই যে লম্বামতো, মাথা ভর্তি চুল, খুব রোগা। অনুপম বলতে লাগলেন বইয়ে পড়া বিজন সিংহর বিবরণ। কিন্তু সে একটা খুনি। খুব পরিকল্পনা করে খুনটি করেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতে পারল না। অথচ বিজন বেশ লেখাপড়া করা মানুষ। সকলে তাকে সমীহের চোখে দেখে। খুনটা করেছিল সে ঠান্ডা মাথায়। পড়তে পড়তে অনুপমের পছন্দ হয়নি। এমন একটা মানুষ কেন খুনি হবে? অনুপম তাই বিজন সিংহকে ভালো মানুষ বললেন। বিজনের খুন কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছিল অন্য একজনকে।

বিদিশা বলল, বাবা, আগে তো এঁর নাম শুনিনি।

শুনেছিস, তোর মনে নেই।

শচীন আঙ্কেল, রতন আঙ্কেল, অতনুপ্রজ্ঞান রায়, কিন্তু বিজন সিংহ তো শুনিনি বাবা। বিদিশা বলল, তোমাকে শালবনি যেতে হবে না, তুমি সিউড়ি এসো, আমরা শান্তিনিকেতনে একটা ফ্ল্যাট কিনেছি, তুমি এলে ক'দিন শান্তিনিকেতন যাব।

শালবনি থেকে ফিরে এসে যাব। বললেন অনুপম। কথাটা শেষ করে দিতে চাইলেন।

তখন ওর সামার ভ্যাকেশন শেষ হয়ে যাবে। বিদিশা বলল, ভ্যাকেশনের পরই এক্সাম।

এক্সামের পরই যাব। অনুপম বললেন। কথা থামিয়ে দিলেন, এত চাপ দিস কেন?

।। দুই ।।

ইদানীং এইটা হয়েছে। ছেলে মেয়েরা তাঁকে বন্দি করতে চাইছে মনে হয়। অনুপম মুক্ত হতে চান। একা থাকার আলাদা এক আনন্দ আছে। তা নষ্ট হতে দেবেন না অনুপম। টের পেলেন মেয়ে ফোন রেখে দিয়েছে। চুপ করে বসে থাকলেন অনুপম। রাস্তার ওপারের ব্যালকনি কখন ভরে গেছে জানেন না। সেই প্রৌঢ়া বসে আছেন চেয়ারে। তাকিয়ে আছেন এদিকে। অনুপম উঠে ঘরের ভিতরে গেলেন। ফ্লাস্কে চা আছে। পেয়ালায় ভরে নিতে নিতে কী মনে হল, বাম হাতের আঙুলে বিদিশার নম্বর ডায়াল করলেন। বেজে যাচ্ছে। বাজতে বাজতে থেমে গেল। খুব রেগে গেছে মেয়ে। তিনি নিশ্চিন্তে বসলেন সোফায়।

সারাদিন তাঁর কাজ কী? খবরের কাগজ, টিভি, ল্যাপটপ-এ ইন্টারনেট সার্চ, ফেসবুক, ইউটিউবে গান, সিনেমা এবং লাইব্রেরি থেকে আনা বই। তিনি দুপুরে ঘুমতে পারেন না। মাইক্রো ওভেনে ভাত তরকারি গরম করে নিজেই ভাত বেড়ে নেন। একটু বেশি ভাত রাঁধতে বলেন আনুর মাকে। কেন? না এইটা ছিল কুন্তলার অভ্যাস। একজনের মতো বেশি। সেই ভাত বিকেলে এসে খায় রুকসানা মাসি। রুকসানার আগে কাজ করত গীতা, তার জন্যও এই ব্যবস্থা ছিল। তিনি করেছিলেন। তার আগে মেনকা ছিল। কুন্তলা তার জন্য ভাত রেখে দিত। তিনি সেই অভ্যাসটা বজায় রেখেছেন। রুকসানা এসে বাসন ধুয়ে কিচেন পরিষ্কার করে খেতে বসেছে কিচেনের মেঝেয়। নিঃশব্দে খেয়ে নেয়। মাছ আর ভাত।

শীর্ণকায় বছর চল্লিশের রুকসানা, সমস্ত মুখে অপুষ্টির চিহ্ন। স্বামী একটি ব্যবসা করে। রেডিমেড জামাকাপড় হাওড়া এবং মেটিয়াবুরুজের কারিগরদের কাছ থেকে নিয়ে এসে দোকানে সাপ্লাই দেয়। তার খুব শখ নিজেই একটা দোকান দেবে তাদের মহল্লায়। হয়ে উঠছে না।

রুকসানা যখন খায় তিনি ঘর থেকে বের হন না। রুকসানা লজ্জা পায়। সকালে কাজে বের হয়। সারাদিন এবাড়ি ওবাড়ি করে সাড়ে তিনটে নাগাদ এই ফ্ল্যাটে ফিরে আসে বাসন ধুতে আর কিচেন পরিষ্কার করতে। কোনও দরকার হয় না, পরের দিন সকালে একজনের খাওয়া থালা বাসন ধুতেই পারে, সঙ্গে কড়াই, হাতা খুন্তি, ডেকচি। সকালে সে আনুর মায়ের আগে আসে। কিন্তু সে বিকেলেই আসে এইটুকু কাজ করতে। না এলে ভাত পাবে না। সপসপ করে ভাত মাছ খেয়ে সে বেরিয়ে যায় বাইরে থেকে দরজা টেনে দিয়ে। আনুর মা সকালে দু-বেলার রান্না করে যায়। রুকসানা অবশ্য সপ্তাহে দুদিন কাচাকাচি করে। আগে ওয়াশিং মেশিনে ওটি করত কুন্তলা। কিন্তু রুকসানা ওয়াশিং মেশিন চালাতে পারে না। কাঠের একটা ব্যাটন দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে কাচে। জামাকাপড় ইস্ত্রি করে এনে দেয়। অনুপম বোঝেন এমনি সে ভাত নিতে চায় না। যখন অনুপম মেয়ের কাছে যান রুকসানার খুব অসুবিধে হয়। অসুবিধে হয় যখন তিনি বেড়াতে যান কোনও প্রাক্তন কলিগের বাড়ি, রানাঘাট কিংবা শিলিগুড়ির দিকে, কিংবা যখন যান দাঁড়ের মাঠ গ্রামে। সাত-আট দিন হয়ে যায় ফিরতে। দুপুরের ভাত তার খুব দরকার। অনুপম মাছও কেনেন তার জন্য। তিনি যেদিন যেখানেই যাত্রা করেন, রুকসানা জিজ্ঞেস করে, কবে ফিরবে, তাড়াতাড়ি চলে এসো দাদা, বাড়িতে বিশরাম নেবে, ভালো থাকবে, এত বয়স হল, এখন এত ঘুরাঘুরি ঠিক না।

রুকসানা গেছে, তিনি ভাবলেন বিদিশার রাগ ভাঙাতে হয়, ডায়াল করলেন। বিদিশা ধরল। খুব গম্ভীর। অনুপম বললেন, মেয়েকে নিয়ে তুই কদিন আয়।

না বাবা, আমরা ভাবছি পুরী যাব, তুমি কি যাবে আমাদের সঙ্গে?

উঁহু , আমি তো জানুয়ারিতেই পুরী ঘুরে এলাম।

আবার যেতে অসুবিধা আছে?

তিনি বললেন, আমি পরের মাসেই ডুয়ার্স যাব, এখন বেরব না।

বাবা, তুমি আমাদের সঙ্গে ডুয়ার্স গেলে না তখন, পুজোয় গেলাম।

অনুপম বললেন, তোদের সঙ্গে কেন যাব বল দেখি, আমার বন্ধুদের সঙ্গে তো আমি যাব।

কেন আমরা তোমার বন্ধু হতে পারি না? বিদিশা রাগ করল।

অনুপম চুপ করে থাকলেন, তারপর খুব শান্ত গলায় বললেন, তোর সমস্যাটা কী বলতে পারিস?

বিদিশা বলল, বাবা, তুমি সিক্সটি সিক্স রানিং, তুমি একা থাকো, আমার আর দাদার এইটা সমস্যা।

সমস্যা তৈরি করলে সমস্যা, যখন তোর মা নার্সিং হোমে গেল, তোর দাদা ইউএস, তুই দিল্লি, আমি কি একা সব করিনি? অনুপম শান্ত গলায় বললেন, তখন থেকেই তো আমি একা থাকি।

বাবা, ওসব কথা বাদ দাও, কথায় কথা বাড়বে, মায়ের চিকিৎসা ঠিকভাবে কি হয়েছিল?

তিনি বললেন, খুব খারাপ লাগে তোদের এই কথা শুনতে, তুই পুরী ঘুরে আয়, আমাকে আমার মতো থাকতে দে। কথাটা বলে তিনি তৈরি হতে আরম্ভ করলেন। বিকেলে তিনি একা। বিকেলের অনেক আড্ডা আছে। কোথাও তিনি নেই। একা একা পশ্চিমে হাঁটেন তিনি। পশ্চিমে গঙ্গা আছে। গঙ্গা অবধি হেঁটে যান বিটি রোড পেরিয়ে। ওদিকটা পশ্চিমাদেরই মহল্লা। বেশিরভাগ হিন্দিভাষী। মিলে কাজ করে, গোডাউনে কাজ করে। কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির শ্রমিক মহল্লা এদিকে। তাঁর ফ্ল্যাটে একটি লোক আসত বাসন বেচতে। বাসনের ঝাঁকার ভিতরে ছোট জ্যারিকেনে গঙ্গাজল। কুন্তলা নিত। লোকটাকে গঙ্গাজল বলে ডাকত কুন্তলা। কুন্তলার মৃত্যুর পর সে আর আসে না। কেন আসে না কে জানে? লোকটা বুড়ো হয়েছিল। দেশ ছিল পাটনা পুবে ২৫ মাইল দূরে এক গ্রামে। সেও গঙ্গার ধারে। গঙ্গাজল কি দেশে ফিরে গেছে? ওর নাম জানা নেই। বাসন ফেরি করত। বাসন ফেরি করা একটা লোক, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা শার্ট আর ধুতি, মাথার চুলের অনেকটাই সাদা, এমনি বর্ণনা করলে কি তার হদিশ পাওয়া যাবে? হয় নাকি? তিনি গ্যালিফ স্ট্রিট ধরে গঙ্গার ধারে চলে এলেন। এদিকে আগে ট্রাম চলত। বন্ধ হয়ে গেছে। লাইন পড়ে আছে। এমনই তিনি দেখেছিলেন শিবপুরে। ট্রাম ডিপো নামটি এখনও আছে। লাইন ক্রমশ পিচের নীচে চলে গেছে। তিনি গঙ্গার পাড়ে একটি বেঞ্চে বসলেন। ওপারে বেলুড় হবে। হাওড়া জেলা। ওপারে সব চিমনির ধোঁয়া এখনও বন্ধ হয়নি। একটি লোক এল। বেঞ্চের প্রান্তে বসল। লম্বা। গাল ভর্তি না কামানো দাড়ি। চোখ ঝিমঝিমে। সিগারেট পুড়ছে ওর হাতে। জামাকাপড় পরিষ্কার। বছর ষাটের লোকটা তার দিকে তাকিয়ে হাসে, আপনি স্যার তো একা থাকেন।

কে বলল? তিনি বিরক্ত হলেন।

সবাই বলে আপনি একা থাকেন, আর আপনাদের ফ্ল্যাট বাড়িটাও কেমন যেন। লোকটি হেসে বলল।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, কেমন?

যারা কিনেছে তারা কেউ থাকে না, আপনি একটা কিনেছেন এবং থাকেন।

আপনি তো সবই জানেন দেখছি।

জানি স্যার, এনআরআইদের কেনা, তারা দু বছরে একবার ইন্ডিয়ায় আসে, কিন্তু এই ফ্ল্যাটে ওঠে না, তাদের আরও ফ্ল্যাট আছে কলকাতায়।

অনুপম চুপ করে থাকলেন। তাঁর সব খোঁজ রাখে এই লোকটা। বলছে, আপনি খুব লাকি স্যার।

লাকি কেন? তিনি অবাক হলেন।

লোকটা বলল, আমিও আপনার মতো হতে চাই স্যার, আমার নাম ভবতোষ কুণ্ডু।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় থাকেন?

রানি রোড, আপনার রাস্তার পেছনের রাস্তা, জ্ঞানবিতান বইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে গিয়ে প্রথম নয় দ্বিতীয় বাঁক, তিনটে বাড়ি পরে।

বাড়িতে কে কে আছে?

দুই ছেলে এক বোন, বিয়ে হয়নি, খুব কালো, ইস্কুল টিচার, পৈতৃক বাড়িতে তার অংশ আছে, ছেলেরা বিয়ে করেছে, আমার বাড়ি একটা হাট স্যার।

অনুপম চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, আমি বাধ্য হয়েছি একা থাকতে, এখন এইটাই ভালো লাগে।

জানি স্যার, আমি আপনার খোঁজ রাখি, আপনার ছেলে ফরেনে, ওয়াইফ..., ভবতোষ গড়গড় করে বলে যেতে থাকে। অনুপম হাত তুলে থামাতে চাইলেন। কিন্তু ভবতোষ তাঁর জীবনপঞ্জি শেষ করে থামে। একটু দম নিয়ে জিজ্ঞেস করে, ভুল বললাম স্যার?

অনুপম বললেন, না, কিন্তু আপনি ঘরে আমার অজান্তে উঁকি দিয়েছেন, একে তো ভালো মনে নিতে পারলাম না।

আপনার বাড়িতে কাউকে দেখি না, আপনি ওই সাততলা বাড়িতে একা থাকেন, আমার দারুণ লেগেছিল শুনে, সেই কারণে আমি একটু জেনেছি।

কে বলেছে? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

বলা যাবে না স্যার, আমি আপনার সব জানি, আপনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, ফার্স্ট পোস্টিং...।

অনুপম বললেন, আপনি চুপ করুন।

ইয়েস স্যার, চুপ করছি, বাট আমি সেই অমল সেনগুপ্তর বাড়িও দেখে এসেছি, বাড়িটা এখন এক পুলিস অফিসারের, সেকেন্ড ওয়াইফকে কিনে দিয়েছেন, মানে অফিসারের দুটো বিয়ে, সেকেন্ড ওয়াইফ ইয়াং।

কৌতূহলী হলেন অনুপম। কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্ত করলেন। এ কি পুলিসের চর? এত কথা জেনে বসে আছে! যাই হোক, তাঁর জানার দরকার নেই। নিস্পৃহ হয়ে বসে থাকলেন। একা বসেছিলেন। মাথার উপর নিমের ছায়া। লোকটা কি তাকে অনুসরণ করে এসেছে? তবু কী মনে হল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গঙ্গাজলকে চেনেন?

হকচকিয়ে গেল ভবতোষ, বলল, আজ্ঞে গঙ্গার সামনে বসে আছি, ওই তো গঙ্গার জল।

মাথা নাড়লেন অনুপম, উঁহু, তাঁর মানে আপনি সব জানেন না, সব খবর নিতে পারেননি।

তাহলে স্যার, আচ্ছা বুঝেছি, এইটা তো হুগলি রিভার।

উঁহু, আমি তা বলছি না।

গঙ্গাজল তো বয়ে যাচ্ছে।

আপনি সব জানেন না। বললেন অনুপম।

অনেকটা জানি স্যার, আপনি ফরেনে যেতে চান না, আপনি নিজের মতো থাকতে চান...।

আচ্ছা, এসব পুরনো কথা।

আমার খুব হিংসে হয় আপনাকে দেখে, কী আনন্দে আছেন, আমার নিজের একটা আলাদা ঘর নেই পর্যন্ত, ছেলেরা যে নির্দেশ দেয়, আমাকে তা করতে হবে, আমি একটা ঘর খুঁজছি, আলাদা থাকব, একা থাকব। বলতে বলতে ভবতোষ তাঁর দিকে সরে এল, এনআরআই-দের ঠিকানা দেবেন স্যার, আমি চিঠি লিখব, কিংবা ফোন করব, মেল করব, আমি যদি থাকতে পারি একটা ফ্ল্যাটে।

আমার কাছে নেই। বলে উঠলেন অনুপম। তিনি এসেছিলেন একা গঙ্গার সামনে বসতে। এমন তিনি প্রায়ই আসেন। কিন্তু আজ খুব বিব্রত করছে এই লোকটা। একাকিত্ব নষ্ট করে দিচ্ছে। তিনি হাঁটতে আরম্ভ করলেন। বললেন, আমার পিছনে আসবেন না।

ইয়েস স্যার, কিন্তু গঙ্গাজল কী, মানে গঙ্গাজল সিনেমার কথা বলছেন?

নো, প্লিজ, লিভ মি অ্যালোন। অনুপম বিরক্ত হয়ে বললেন।

ওকে স্যার, কিন্তু গঙ্গাজল বুঝতে পারলাম না। ভবতোষ হাত কচলে বলল।

বুঝতে হবে না, দেখতে পাচ্ছেন না গঙ্গার জল! বলে তিনি হাঁটতে আরম্ভ করলেন গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে। চক্ররেলের লাইন বাঁ পাশে। ডানদিকে কাশী মিত্তির শ্মশানঘাট। খোল কত্তালে কীর্তন হচ্ছে একটি মৃতদেহকে ঘিরে। তিনি পেছনে তাকান। না ভবতোষ আসছে না। কিন্তু লোকটা কি সবই সত্য বলেছে? সত্যই তো। তাঁর সম্পর্কে জানে প্রায় সবটা। যেন তাঁর জীবনীকার। কিন্তু গঙ্গাজলকে চেনে না। জানেই না তার সম্পর্কে। এখানেই তাঁর কিংবা গঙ্গাজলের জিত। ফেরিওয়ালা ঢুকতে পারে না তাঁর আবাসনে। লোকটা আবাসনে এসে কী বেচবে? প্রায় সব ফ্ল্যাটই তো তালা বন্ধ। এক সিকিউরিটির বউ তাকে ডেকে বাসন দরাদরি করত। একদিন কুন্তলার চোখে পড়ে যায়। কুন্তলা তার ফ্ল্যাটে আসতে বলেছিল। এই নিঃঝুম আবাসনে তার কথা বলার লোক ছিল না। গঙ্গাজলকে খেতেও দিত কুন্তলা। তাকে একবার শীতে সস্তার কাশ্মীরি শাল দিয়েছিল সে। দু-বছর পুজোয় ধুতি জামা দিয়েছিল। তারপর তো অসুস্থই হয়ে পড়ল। গঙ্গাজল তার মেয়ের বিয়েতে দু-বেলা খেয়েছিল। প্যাকেটে করে মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিল। কুন্তলা অসুস্থ হতে খোঁজ নিত। কুন্তলার মৃত্যুসংবাদে মাথায় হাত দিয়ে সিকিউরিটি প্রশান্ত হালদারের কোয়ার্টারের সামনে বসেছিল লোকটা। পরে এসেওছিল। তারপর আসা বন্ধ করল। ঘুরতে ঘুরতে তিনি ফিরে এলেন পাড়ায়। তখন রাত আটটা। রুটি নিয়ে ঢুকবেন। রুটির দোকানেই আবার ভবতোষ কুণ্ডু, যেন তাঁর অপেক্ষায় বসে ছিল, এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করল, স্যার, এতক্ষণে ফিরলেন?

কেন? অনুপম বুঝতে পারছিলেন এই লোকটা তাঁকে বিব্রত করবে। গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসা লোক কোনও সময়েই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। উদ্দেশ্য আছে কোনও। ভবতোষ বলে, আপনার সব রুটিন ধরা স্যার, ডেইলি এই সময়েই আসেন এখানে, আমি এখানে সবদিনই থাকি, কিন্তু আপনি আমাকে খেয়াল করেননি, কেন করবেন স্যার, আমি কে? কিন্তু আজ সকালেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করব। আমি জানি, সকাল পাঁচটা চল্লিশে মর্নিংওয়াকে বের হন, আটটা কুড়ি নাগাদ ফেরেন ফ্ল্যাটে,... বলেই যাচ্ছে লোকটা। হুবহু বলে যাচ্ছে তাঁর জীবনপঞ্জি মুখস্থ প্রায় খোঁচড়ের মতো। সব জেনেই তাঁর কাছে এসেছে। কত রকম লোকই না হয়!

রাতের রুটি নিয়ে ফিরে এলেন অনুপম। সব্জি রাঁধা আছে, গরম করে নেবেন। মিষ্টান্ন আছে শেষ পাতের জন্য। সুগার নেই তাঁর। ব্লাড প্রেশার আছে, তার ওষুধ রাতেই খান। হৃদয়ঘটিত একটু অসুবিধে আছে। ঘুমের আগে ইকো-স্পিরিন জাতীয় একটি ওষুধ খেতে হয়। আর প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের ওষুধ খেতে হয় নিয়মিত। রাতে একবার ঘুম ভাঙে। এই রুটিন তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করে। আটটার পর বাড়ি ফিরে টিভি দেখেন। সমস্ত দেশের খবর। খুব জরুরি খবর না থাকলে, টেলিভিশনে পুরনো দিনের সাদা কালো কিংবা গেভা কালার, ইস্টম্যান কালারের হিন্দি ছবির গান শোনেন। তা যদি পছন্দ না হয়, ল্যাপটপ খুলে ইউটিউবে গান শোনেন। একটা গান খুব প্রিয়, অশোককুমার সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবিতে লতা মুঙ্গেশকরের গান, রহেনা রহেনা হম...। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর খুব প্রিয়। কণ্ঠসুধাতেই মজে থাকেন। আজ তিনি গানই শুনছিলেন। ১৯৫১ সালে নবীন লতা মুঙ্গেশকরের গান, সাড়ে নটা নাগাদ ফোন এল। অচেনা নম্বর। তিনি যা আন্দাজ করেছেন, ঠিক তাই। ভবতোষ কুণ্ডু। স্যার আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ হয়েছে, কতদিন ধরে আপনার কথা শুনছি, কিন্তু আলাপ করতে সাহস হতো না, অতবড় একটা ফ্ল্যাটে একা থাকেন, আমার কাছে তা স্বপ্ন, হ্যাঁ, স্যার স্বপ্নই, আমি যেন একটা রেল জেলখানার কয়েদির একা থাকার সেলে থাকি স্যার, হাত-পা মেলার জায়গা নেই, আমি খেলা দেখতে চাই, কিন্তু বাড়ির মেয়েছেলেরা সিরিয়াল দেখবে 'ময়না কথা কও', এ জীবনে আমার কোনও সাধ মেটেনি স্যার।

আচ্ছা, পরে কথা হবে। তিনি এড়াতে চাইলেন।

অনুপম ফোন কেটে দিয়েছিলেন। কিন্তু লোকটা পরদিন সকালে ফ্ল্যাটেই চলে এসেছে। কী বিপদ! তাড়িয়ে তো দিতে পারেন না।

॥ তিন ॥

স্যার আসতে পারি, অনেকদিন আসব আসব করি আসা হয় না, আলাপ ছিল না তো, ইস্ কত সুন্দর ফ্ল্যাট, আপনি একা...। তারপর থেকে লোকটা বকেই যাচ্ছে নিজে নিজে। স্যার, আমার নিজস্ব কোনও ঘর নেই, এক ঘরে দুজন থাকি, আমি আর আমার বোন। বোন খুব মুখরা। সে একটা প্রাইমারি ইস্কুলে দপ্তরি। হাজার দশ-বারো মাইনে পায়। আর মিড-ডে মিলের চাল, আলু, ডিম নিয়ে আসে নিজের জন্য। দুপুরে ইস্কুলে খায়। চুরি করে আনা চাল, আলু, ডিম সংসারে দেয়। টাকা ছোঁয়ায় না বিশেষ। বোনের নাম নীলা। আপনি তাকে দেখেছেন। মর্নিংওয়াকে থাকে চিনিদের সঙ্গে। হা হা হাসির দলেও থাকে। বোনের রুখে যাওয়া স্বভাবের জন্যই শ্বশুরবাড়িতে ওকে নেয় না। ও বলে ওর গায়ে কেরোসিন ঢেলে মারতে চেয়েছিল দেওর আর শ্বশুর। স্বামী তো সেলসম্যান। বাইরে ছিল তখন। বোন পালিয়ে এসেছিল। কারণ হল, টাকা।

দেওর নতুন ব্যবসা করবে, তাই শ্বশুর বলেছিল বাপের বাড়ি থেকে লাখখানেক টাকা নিয়ে আসতে। স্বামী ছিল বাপ-মায়ের বাধ্য ছেলে। সে কিছু বলতে পারত না। বাবা আর ভাই যে ওই কাণ্ড করতে যাচ্ছে তা সে জানতে পেরে মেদিনীপুর গিয়ে বসেছিল পিসির বাড়ি। সেলসের কাজ না। ভয় পেয়েছিল। অমেরুদণ্ডী প্রাণী। বোন চলে আসার পর সে এসেছিল দু'বার।...। আসলে বাবা মা-র বিরুদ্ধে যেতে চায় না সে। তাহলে বাড়ি আর জমি থেকে বঞ্চিত হবে। হ্যাঁ স্যার, নিউটাউনের গায়ে রাজারহাট-বিষ্টুপুরে ওর শ্বশুরবাড়ি। ধান জমিই এখন দুলাখ টাকা কাঠা হয়ে গেছে নিউটাউন হওয়ার পর । পনেরো বছর আগেও পনেরো হাজার টাকায় এক বিঘে পাওয়া যেত। শ্বশুরের তিন বিঘে জমি আছে, মানে ষাট কাঠা। তার দাম কত হবে বলুন। তবুও লোভ দেখুন। আসলে ফোকটে ধনী হয়েছে তো। আরও চায়। আরও।

ভবতোষ কুণ্ডু এসেছে বেলা দশটা নাগাদ। তার কাহিনী যেন অনন্ত। সে একটা ঘর চায়। স্যারের তিনটে বড় ঘর, ডাইনিং কাম লিভিং, তিনটে টয়লেট, একটা পেলেই তার চলে যাবে। সে দরকারে ভাড়া দেবে। পেনশন পায়। জমি অধিগ্রহণ বিভাগের গাণনিক ছিল। মানে জমির ক্ষতিপূরণ হিসেব করাই তার কাজ ছিল। কিন্তু সে করত না। করবে কী করে, সে হিসেব বুঝতই না। বরং অন্য কাজ করত। অফিসারের ফাই-ফরমাস খাটত। দরকারে এর তাঁর বাড়ির বাজারও করে দিয়ে আসত। ট্রেনের টিকিট, প্লেনের টিকিট, টেলিফোন আর ইলেক্ট্রিক বিল জমা করা—সব সে করত। এমনকী অফিসার কোনও দিদিমণির সঙ্গে ফুর্তি করতে গেলে সে বাংলো বুক করে দিত। সে যদি এই ফ্ল্যাটের একটি ঘরে আশ্রয় পায় স্যারের আর ভাবতে হবে না। সব কাজ সে করে দেবে। কাজ করতে তার ভালোই লাগে। এখনও এই বয়সে ভবতোষ পাড়ার দশ বাড়ির টেলিফোন বিল, ইলেক্ট্রিক বিল জমা করে।

বিরক্ত অনুপম বললেন, আপনি এখন আসুন।

আজ্ঞে স্যার, আমার কথায় কি রাগ করলেন? ভবতোষ হাত কচলায়।

না, কিন্তু আমার সব শোনা হয়ে গেছে, ইউ ক্যান গো নাউ।

ইয়েস স্যার, আসলে কী আমার বোনকে নিয়েই যত অশান্তি, বোন খুব টেঁটিয়া, বলছে বাড়ির অর্ধেক অংশ তার প্রাপ্য, সে মামলা করে বুঝে নেবে। ভবতোষ তার সহানুভূতি চাইল।

আমি তার জন্য কী করতে পারি? অনুপম গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন কথাটা।

কিছু না স্যার, আসলে আমরা ভাই বোন, আমাদের এক ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার বউ লিলি, বাকি ঘর তিনটে দুই ছেলে আর তার মা, আমার বউ আমাকে তার ঘরে ঢুকতে দেয় না, ঠাকুর-দেবতা সাজিয়ে, নিজের মতো আছে। আর একটা কথা স্যার, বোন বাড়ি থাকলে আমি ঘরে প্রায় ঢুকতেই পারি না, তার মেয়েবন্ধুরা এসে গল্প করতে বসে বিকেল থেকে, আর ছুটির দিনে সকালে যদি বাড়ি থাকে, দরজা বন্ধ, এখন এসো না, তুমি অন্য ঘরে গিয়ে বসো, দেরি হবে।

অনুপম বুঝতে পারছিলেন পারিবারিক চিত্রটি। বললেন, আপনার ফ্যামিলি ম্যাটার, আমি শুনে কী করব, আর পরিবারের ব্যাপার বাইরে না বলাই ভালো, সব কিছু ভালো হয় না।

ইয়েস স্যার, আই নো ইট, কিন্তু আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন তো, সকালে যখন ও ইস্কুলে যায়, তখন ঘরটা ফাঁকা থাকে, আমি একটু আরামে থাকি ওই ক'ঘণ্টা—, বারোটায় বাড়ি এলেই সব সুখ জলে যায়, এত গরমের ভিতর পার্কের গাছতলায় গিয়ে বসে থাকি।

লোকটা যেন এঁটুলির মতো এঁটে থাকতে চাইছে। অনুপম বললেন, গাছের ছায়া খুব আরামের, যদি তা ফ্রি পাওয়া যায়, আপনি এখন যান, আমার কাজ আছে, পরে শুনব।

কী কাজ স্যার, আমি করে দেব? ভবতোষ ঝুঁকে পড়ল তার দিকে, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, ছায়া ফ্রিই তো হয় স্যার, তা যদি ছায়া হয়, ভগবান সবই তো ফ্রি দিয়েছেন, জুটিয়ে নিতে হয়।

ঠিক আছে, আপনি এখন যান। একটু রুক্ষ গলায় বললেন অনুপম।

আচ্ছা স্যার, কাল পরশু আবার আসব, আসলে আজ তো ছুটির দিন, নীলা বেরয়নি ইস্কুলে, চিনি বলে মেয়েটা এসেছে, ওরা এখন গীতা আলোচনা করছে, চিনি মানে চঞ্চলা তো এই নিয়েই থাকে, চেনেন তো তাকে, মর্নিংওয়াক করে, মা বাবা নেই, বাবার পেনশন পায়, তা দিয়ে ঠাকুরের সেবা করে।

অনুপম বুঝতে পারছেন চিনির থেকেই কথাটা ভবতোষের কাছে গেছে। চিনি তাকে প্রায়ই বলে, একা থাকেন কী করে কাকু, ভয় করে না?

তুমিও তো একা থাকো, তোমার ভয় করে না? অনুপম পাল্টা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

চিনি হেসে বলেছিল, আমি তো একা থাকি না কাকু।

তাহলে আর কে থাকে তোমার সঙ্গে? অনুপম জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আমি তো ঠাকুর নিয়ে থাকি কাকু, তিনি তো সব সময় আমার সঙ্গে থাকেন, আমি একা কই, ঠাকুরের সঙ্গে আমার কথা হয় কাকু। বলে চিনি আবার হেসেছিল, কাকু আপনি আমার কাছে আসুন ঠাকুরের কথা শোনাব আপনাকে, মহাপুরুষের কথা শুনলে আপনি শান্তি পাবেন।

অবাক হয়েছিলেন অনুপম, সামান্য বিরক্তিও এসেছিল মনে। তাঁকে নিয়ে এরা আলোচনা করে তাঁর অসাক্ষাতে। কিন্তু তা মুখে প্রকাশ করেননি। তিনি নিজের সম্ভ্রান্ত ভাব কখনও নষ্ট হতে দেন না, শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি যে শান্তিতে নেই এই কথা বলল কে?

একা থাকেন কাকু, কাকিমা নেই, দাদা বিদেশে, বোন তার সংসারে, কেউ ভালো থাকতে পারে, মনে শান্তি থাকে? চিনি হেসে হেসে বলেছিল, ঠাকুর একা মানুষের সহায় হন, আপনি আমার ফ্ল্যাটে আসুন, দেখবেন ঠাকুর কত জাগ্রত, আপনাকে পথ দেখাবেন।

তিনি বলেছিলেন, তোমার ধারণা ভুল, আমার কোনও অসুবিধে হয় না।

আপনার পাশে ঠাকুর দাঁড়াতে পারেন, আপনি একদিন আসুন কাকু। চিনি, চঞ্চলা তাকে ডেকেছিল। তিনি যাননি। যার যা বিশ্বাস, তা তার কাছেই থাকুক। চিনি অহেতুক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে মাথা গলাতে চাইছে। কিন্তু চিনি মেয়েটি ভালো। সরল। নিজের বিশ্বাস নিয়ে আছে। ওর ঠাকুরের বাণী নিয়ে থাকে। খুব সরল দার্শনিকতা। সরল জীবনবোধ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত চিনি পড়েনি। তার ঠাকুরের বাণী অমন ইঙ্গিতময় নয়। কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তদের জন্য কিছু কথা বলে গেছেন এই জীবন আর জগৎ সম্পর্কে। চিনি গীতার অনেক শ্লোক মুখস্থ বলতে পারে। তার ঠাকুরের বাণী আর গীতার বাণী অনেকটা এক রকম। মনে হয় চিনিই ভবতোষকে তাঁর খবর দিয়েছে। অথবা ভবতোষ তাঁর খবর নিয়েছেন চিনি কিংবা সসীম রায়ের কাছ থেকে। ফোন বাজল। অচেনা নম্বর। ভবতোষ নাকি? নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই বাড়ি থেকে বেরিয়েই ফোন করেছে। কিন্তু তার নম্বর তো অন্য। গত রাতে তিনি সেভ করে নিয়েছেন। তিনি ফোন কেটে দিলেন। একটু বাদে আবার বাজল ফোন, তিনি ধরবেন না ধরবেন না করে ধরলেন, হ্যালো?

বাবলুদা, আমি সুমিত্রা, সুমি! কথাটা যেন পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর দূর থেকে ভেসে এল। বুকে এসে আছড়ে পড়ল।

বাবলুদা! তাঁর বাল্যকালের নাম। এই নামে যাঁরা ডাকতেন, তাঁরা কেউ বেঁচে নেই। মন প্রশান্ত হয়ে গেল। কে আবার এই নাম নিয়ে ফিরে এল। সুমি কে? তিনি আনমনা হলেন। চোখের সামনে দাঁড়ের মাঠ ভেসে উঠল অবারিত প্রান্তর নিয়ে। কে যেন সেই মাঠ

থেকেই ডাক দিল, বাবলুদা...।

ওপার থেকে মহিলা কণ্ঠ তাঁকে বলল, ভুলে গেলে বাবলুদা, ছেলের বিয়ে দিলে, মেয়ের বিয়ে দিলে, আমাদের বললে না, তুমি না রাখতে পারো, আমি তোমার সব খবর রাখি।

সুমি? সুমিত্রা! মনে পড়ল, মায়ের সই তৃপ্তিমাসির মেয়ে। পূর্ববঙ্গে এক গ্রামে বাড়ি, তৃপ্তিমাসির তিন মেয়ে, সুমি, রুমি, ঝুমি। কতদিন আগের কথা এসব। ওপার থেকে এক্সচেঞ্জ করে বর্ধমানে এসেছিল। তার আগে এই বড় মেয়েকে পার করে দিয়েছিল তাদের বাড়ি। শুনেছিল সুমির বিয়ে হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। মাথাভাঙা না কোথায়। সুমির সঙ্গে কিশোরবেলায় তাঁর মধুর সম্পর্ক হয়েছিল। সুমি প্রায় একবছর দাঁড়ের মাঠে তাদের বাড়ি এসে ছিল। তখন ওরা বর্ধমানে বিনিময় করে আসেনি সাতক্ষীরে থেকে। কত হবে তখন সুমির? পনেরো। সে সতেরো। বিকেলে লুকোচুরি খেলতে খেলতে সন্ধে হয়ে গেল। পূর্ণিমা কিংবা চতুর্দশী ছিল। সুমি তাঁকে জাপটে ধরেছিল আমগাছটির আড়ালে। মনে আছে ওর? আমাকে ভালোবাসো বাবলুদা! তিনি তো ভোলেননি। চোখের সামনে জ্যোৎস্না রাতে আমগাছটির ছায়ার আড়ালে দেখতে পেলেন অনুপম সদ্য যুবতী মেয়েটিকে। ফুলফুল ছাপের ফ্রক। বেশ বড় তা। সুমির বাড় ছিল বেশি। কেশবতী ছিল। চুল ছেড়ে দিলে হাঁটুর নীচ অবধি নেমে আসত। তার চুল দেখতে কতবার যে তাকে খোঁপা ভাঙতে হয়েছে অনুপমের সামনে। মাথাভাঙা কতদূর! জানতেন না তিনি সুমির খবর। এক অফিস কলিগ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, গিরিডাঙায় আপনার এক বোন থাকে?

না তো, আমার বোন ভোপালে থাকে!

আপনার বোন, সুমি, সুমিত্রা চন্দ।

সুমি বর্ধমানে কারও সঙ্গে জড়িয়েছিল। কী হয়েছিল সবটা ভালো জানেন না অনুপম। কিন্তু দরকার পড়েছিল উত্তরবঙ্গে বিয়ে দেওয়ার। অনুপম সুমির বিয়েতে যাননি। যেতে পারেননি।

সেই সুমি ফোন করেছে। খবর দিচ্ছে, তার মা, তৃপ্তিমাসির মৃত্যু হয়েছে বছর পাঁচ আগে। তিনি মনেও করতে পারেন না তৃপ্তিমাসিকে। তখন অনুপম কুন্তলার জন্য নার্সিংহোম আর বাড়ি করে বেড়াচ্ছেন। কুন্তলার মৃত্যুসংবাদ সুমি পেয়েছে। পাওয়ার কথা তো নয়। আত্মীয়স্বজন তো নয়। আর নিজেই অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন অনুপম। কুন্তলার মৃত্যুর পর একা থাকতেই পছন্দ করেন। কিন্তু সুমি তাঁর ফোন নাম্বার পেল কোথা থেকে?

হ্যাঁ গো বাবলুদা, তুমি নাকি একাই থাকো? সুমি জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, উপায় কী? অনুপম বললেন।

তুমি আমেরিকা চলে যাও, এখানে পড়ে আছ কেন? সুমিত্রা বলল, আমি তোমার সব খবর রাখি।

অনুপম বললেন, তুই কি এই উপদেশ দিতে ফোন করলি?

না, একা থাকো কি না, তাই বললাম।

আমার নম্বর কে দিল? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

সে পেয়েছি, এখন নম্বর পাওয়া অসুবিধে?

অনুপম বললেন, কী করে পেলি বল না।

হাসল সুমি, বলল, তোমার ছেলে সূর্য আর আমার ছেলে শোভন বন্ধু গো।

বন্ধু! কী করে, তোর ছেলে তো দেখেইনি সূর্যকে। অনুপম বিস্মিত হলেন।

সুমি বলল, ফেসবুক গো, তুমি ফেসবুক জানো না, তোমার ফেসবুক থাকলে কবে আমাদের দেখা হয়ে যেত।

তাঁর একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে, কিন্তু তা খোলেন কম। ইন্টারনেট ব্যবহার করেন ইউটিউবের জন্য বেশি। ফোনে হোয়াট'স অ্যাপ আছে, তা তেমন ব্যবহার হয় না। তিনি বুঝতে পারেন যোগাযোগের জায়গাটি এখন তেপান্তরের মাঠের মতো হয়ে গেছে। দিশাহীন, যে কোনও দিকে চলে যাওয়া যায়। দেশ-বিদেশ, সব একাকার। সুমিত্রার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নেই অনেক বছর। তার ছেলে শোভনের সঙ্গে টুটুলের বন্ধুতা হয়েছে ফেসবুকে। টুটুলই সব খবর দিয়েছে। মা নেই। বাবা একা থাকেন। বাবা বছরে ছ'মাস তো ইউএস-এ আসতেই পারেন, কিন্তু একবারও আসেননি। বোন চেয়েছিল, বাবা তার কাছে থাকেন, কিন্তু বাবা থাকবেন না। এই বয়সে একটা লোক একা থাকে, খুবই চিন্তার। কেন বাবলুদা, তুমি যাওনি কেন?

অনুপম বললেন, তোর কথা বল।

আমি তো বলছি, বলার জন্যই ফোন করেছি, তোমার কত বয়স হল বাবলুদা?

সেভেনটি টাচ করেছি।

কী সুন্দর চেহারা রেখেছ তুমি, কুন্তলা বউদির চেহারাটা অসুখে নষ্ট হয়ে গিছিল।

পৃথিবীটা ক'বছরেই বদলে গেল। ভুবনগ্রামে কেউ আর অচেনা থাকছে না। সুমিত্রাকে তার ছেলে শোভন ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, মা এঁদের চেনো? যেভাবে হোক সুমিত্রা চিনেছে তাদের। সুমিত্রা তাঁর পৌত্রকেও চিনেছে। ছেলে ছেলের বউকেও। তারা কোন শহরে থাকে তাও জানে। তারা নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিল, সেই ছবিও দেখেছে সুমিত্রা। সুমিত্রা তার নিজের কথা বলছে এবার। তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে মালদায়, জামাই পিডব্লিউডি-তে চাকরি করে, নিজেদের বাড়ি, বাবা-মায়ের এক ছেলে, আর এক মেয়ে মাথাভাঙাতেই প্রাইমারি মাস্টার, ছেলে ছোট, বি এসসি পাশ করেছে, চাকরির চেষ্টা করছে। বাবলুদা, তোমার কি আর আমার কথা মনে আছে?

॥ চার ॥

সুমিত্রাই বলে যাচ্ছে। তিনি শুনতে শুনতে ফোন কান থেকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন। হুঁ-হাঁ করছিলেন। সুমিত্রা বলছে, ইদানীং তোমার কথা খুব মনে পড়ত বাবলুদা, কিন্তু এইভাবে যে যোগাযোগ হয়ে যাবে ভাবিনি, তোমাকে দেখতে পাব ভাবিনি।

তুই দেখলি কী করে? অনুপম অবাক।

আমার ছেলে দেখাল, মা এঁকে চিনতে পারো, আমি কিন্তু একবারেই চিনেছি, আমার ছেলের মোবাইল ফোনে তোমার ছবি রয়েছে, তোমার ছেলে আমেরিকা থেকে পাঠিয়েছে, সকলের ছবি। সুমিত্রার গলা বুজে এল, এত বয়স তোমার, কিন্তু বোঝাই যায় না বাবলুদা, কী হ্যান্ডসাম রয়েছ!

তোর হাজব্যান্ড? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, ক্যানেল রেভিনিউ অফিসার ছিল না?

তুমি জানো? কে বলল? তুমি কী করে ভুলে গেলে আমাকে, আমাকে তোমার মনে আছে বাবলুদা?

তোর হাজব্যান্ড রিটায়ার করেছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিল, কিন্তু রিটায়ার করার পরপর চলে গেল, ছ'মাস আগে হলে ছেলেটা চাকরি পেয়ে যেত, এসডি তাই বলেছিল, ডাই ইন হারনেস তো হয়নি, ওর খুব সুগার ছিল, আর, থাক বাবলুদা সব কথা বলা যায় না।

অনুপম বলল, থাক বলতে হবে না।

আগের গরমেন্ট থাকলে হতোই, পার্টির নেতারা আমাকেও চিনত, করিয়ে নিতাম, এখন আর হচ্ছে না, ছেলে অবশ্য ঢুকে গেছে সরকারি পার্টির ভিতরে, যাকগে সে লোক তো বিছানায় পড়ে ছিল, পাঁচ বছর হল নেই, তোমার বউ যেমন গেছে, আমার বর, রোগের ডিপো ছিল, খরচা করেছি কম না, কিন্তু থাকল না,

তুমি তো ভালো আছ শুনেছি। সুমিত্রা তার বানানো হা-হুতাশের কথা বলতে আরম্ভ করে এইবার। দুঃখের কথা। হ্যাঁ, দুঃখ একরকম বিলাসই। সুমিত্রার অভাব নেই। সম্পন্ন গৃহস্থ। জমি-জমাও আছে। কিন্তু দুঃখ না থাকলে সাত কাহন করে সে বলবে কী? বানিয়ে বানিয়ে দুঃখের কথা? অনুপম জানেন দুঃখও পরিমিত পরিমাণে থাকা দরকার মানুষের জীবনে। সুমিত্রা বলছিল সেই দুঃখের কথা। এসব কথা কতসময় ভালো লাগে। তোর সুগার আছে? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

না গো, কিন্তু পায়ে ব্যথা, হাঁটুতে, চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। বলল সুমিত্রা, বাবলুদা, তুমি আমার সেই বাবলুদা, জ্যোৎস্না রাতে মেসোমশায় বললেন, আয় সবাই মিলে লুকোচুরি খেলি, কী ভালো ছিলেন তিনি, আজ এত ভালো লাগছে তোমার সঙ্গে কথা বলে!

অনুপম বুঝতে পারছিলেন কথা ফুরিয়ে আসছে, আর কী কথা হবে এখন? লতা মঙ্গেশকরের গান? সত্যজিতের ছবি, রাজনীতি, খেলা? সুমিত্রা নিশ্চয় এসব কথা বলতে ফোন করেনি। সে এসবের খোঁজ না রেখেই দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুই বর্ধমান আসিস না?

ভাইরা সম্পর্ক রাখে না বাবলুদা, তবু যাই, আমার তো অংশ আছে ওই বাড়িতে।

কলকাতা আসিস না? অনুপম জিজ্ঞেস করল।

না, আমাদের আত্মীয় সব অসমে, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি, গুয়াহাটি, ওদিকের সঙ্গেই যোগ বেশি।

গোয়ালপাড়ার গান শুনেছিস? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, তোর সেই চুল আছে?

তুমি শুধু খুলে দেখাতে বলতে, তোমার বন্ধুরা এলেও বলতে সুমির চুল দেখবি, কত চুল!

আছে তা? অনুপম সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন।

চুপ করে থাকে সুমিত্রা। চুপ মানে নেই। না, নেই। এতদিন কি ওসব থাকে বাবলুদা? সুমিত্রা গাঢ় স্বরে বলল, তুমি আমাকে খুব খাটাতে, চুল খুলে আবার খোঁপা করা, দেখে যেন আশ মিটত না, উফ কী দিন গেছে সেই চোদ্দো মাস।

চুল নেই তো, বেঁচে গেছিস, না হলে এখনও চুল দেখাতে হতো তোকে। অনুপম বললেন।

কী যে বলো তুমি বাবলুদা, সেই রকমই আছ ঠিক। সুমিত্রা বলল, বাবলুদা, শোভনকে খুব ভালোবাসে টুটুল, ওদের চ্যাট হয়, শোভন একটা ইন্টারভিউ পেয়েছে, কলকাতা যাবে, কিন্তু কলকাতায় তো আমাদের কেউ থাকে না, থাকার জায়গা নেই, কোথায় উঠবে?

কবে ইন্টারভিউ? জিজ্ঞেস করলেন অনুপম।

সামনেই, এদিকে কি চাকরি আছে, চেষ্টা করল খুব, টুটুল মানে সূর্যনীল তখন বলল তোমার ওখানে যেতে, তুমি একা থাকো, একদিন ভিডিও কল হল, তোমার ছেলেটা এত ভালো, কী বলব দাদা।

আচ্ছা, কিন্তু ...., বলতে গিয়ে থেমে গেলেন অনুপম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কবে আসতে চায়?

সুমিত্রা বলল, ফোনটা ওকে দিচ্ছি বাবলুদা, ওই বলুক। অনুপমের ফোনে ভেসে এল ভারী কণ্ঠস্বর। সে শোভন। বলল, মামা প্রণাম নিও, আমি তোমার কাছে শিয়ালদা থেকে কী করে যাব, একটু বলে দাও।

ইন্টারভিউ কবে? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

খুব সামনে মামা—শোভন জবাব দেয়।

কবে আসতে চাও? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

ধরো দশ তারিখ নাগাদ।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, এত আগে কেন?

আরও কটা খোঁজ করতে হবে, একটু কাজ আছে মামা। শোভন কত ঘনিষ্ঠ হয়ে উত্তর দিল, কলকাতায় কি একটা কাজ নিয়ে যাওয়া হয়?

তুমি কলকাতা এসেছ আগে? জিজ্ঞেস করলেন অনুপম।

হ্যাঁ, যাওয়া তো হয়, শিয়ালদার হোটেলে উঠি আবার অন্য কারুর বাড়িতে উঠি, মামা তোমাদের ওদিকে বৃষ্টি হচ্ছে? শোভন আচমকা প্রসঙ্গ বদলে দিল, সে আর তার আশ্রয় নিয়ে কথা বলতে চায় না। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিয়ে বিষয়টি সেটল করে নিল যেন শোভন।

অনুপম বুঝলেন শোভন ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান। সে তাঁর সম্মতি তো আদায় করেই নিয়েছে বলা যায়। আসার তারিখ বলে দিয়েছে। এখন ওই প্রসঙ্গে কথা না বলাই ভালো। সে বর্ষার কথা তুলে বলল, খুব বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। মৌসুমী মেঘ আগেই এসে গেছে ওখানে। তাই-ই হয়। উত্তরের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সেই মেঘ দক্ষিণের দিকে যাত্রা করে। এবারে আসছে না এদিকে, অথচ উত্তরদেশ ভেসে যাচ্ছে বর্ষায়। খুবই চমৎকার আবহাওয়া। রাতে গায়ে চাদর দিতে হয়। বিনা মন্তব্যে শুনতে শুনতে আচমকা ফোন কেটে দিলেন অনুপম। আবার ফোন বাজল। হ্যাঁ, সেই ফোন। তিনি বললেন, ঘরে গেস্ট এসেছে, পরে কথা হবে।

আচ্ছা মামা, কখন তুমি ফ্রি থাকো, ও তুমি তো সব সময়ই ফ্রি, দেখো মামা আমি এখানকার যুব সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট।

অনুপম বললেন, রাখছি।

ফোন কেটে দিয়ে বিরক্তিতে মন ভরে গেল। সুমিত্রা কি সেই কৈশোরের অধিকার দাবি করছে? তা কি হয়। সেই কিশোরী তো মিলিয়ে গেছে কালের গর্ভে। নাকি ভেসে আছে কোথাও। আজ দিনটা খারাপ শুরু হয়েছে, না ভালো—তা বুঝতে পারছেন না। সকালে চিনি একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে তার কাছে মহাভারত ফেরত চাইতে। কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়তে নিয়েছিল চিনি। তা প্রায় মাস দেড়েক হয়ে গেছে। ক'দিন ধরে তাঁর মনে হচ্ছিল মহাপ্রস্থান পর্ব আর একবার পড়েন। দ্রৌপদীকে সব চেয়ে ভালোবাসত ভীম। শাঁওলি মিত্রর নাটক নাথবতী অনাথবৎ পাঠ শুনলেন তিনি সেদিন সিডিতে। মনে হল মূল মহাভারতে কী আছে একটু দেখলে হতো। নাটকটি অসামান্য। তিনি সকালে চিনির কাছে মহাভারত চাইলে সে বলল, শেঠকাকুর মাসির মেয়ে নিয়ে গেছে তার শাশুড়ির জন্য। তিনি পড়ছেন, পড়ে ফেরত দেবেন। শুনে মনে হল, এইটি খুব অন্যায়। চিনি বলল, সে পড়েনি, সবে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু তখনই স্বাতী এসে গেল। স্বাতী রতন শেঠের আপন মাসতুতো বোন। না দিয়ে পারে?

আমি তো তোমাকে দিয়েছিলাম পড়তে। অনুপম বলেছিলেন।

কিন্তু শেঠকাকুর মাসতুতো বোন স্বাতী যে নিতে চাইল শাশুড়ির জন্য। চিনি বোঝাতে চেয়েছিল।

মহাভারত তো ছোট উপন্যাস নয় বা খবরের কাগজ, সিনেমা ম্যাগাজিন নয় যে অন্যের কাছ থেকে নিয়ে পড়া যায়, কিনে নিতে বলো, বইটা আমার দরকার। ক্ষুব্ধ গলায় বলেছিলেন অনুপম।

রাগ করলেন কাকু, আচ্ছা আমি যদি পড়তাম?

তোমাকেই তো পড়ার জন্য দিয়েছিলাম। অনুপম ক্ষুব্ধ স্বরে বলেছিলেন।

আমার বদলে না হয় শেঠকাকুর মাসতুতো বোনের শাশুড়ি পড়ছে, খুব ধার্মিক উনি, ঠাকুরের সিংহাসনে যত্ন করে রেখে দিয়েছেন আপনার বই, ধূপধুনো দিয়ে তবে পাতা খোলেন। চিনি হেসে হেসে শোনাল।

খুব সন্তুষ্ট হননি অনুপম। বরং রতন শেঠের নাম শুনে বিরক্তিতে মন ভরে গিয়েছিল। মহাভারতের গায়ে কি এবার সিঁদুর লেপা হবে? আসলে তিনি পড়ার লোক নন। মহাভারত লোকের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে কি পড়া হয়? চিনিরও বইয়ে কোনও আকর্ষণ নেই। সে চায় লোকে ধর্মপথে আসুক। তাঁর মনে পড়ল সেই মেদিনীপুর শহরের কথা। অমল সেনগুপ্ত খুব বই পড়তেন। কিনতেন বই। লাইব্রেরি থেকেও নিয়ে আসতেন। ওঁর কথায় কুন্তলা অভ্যাস করে বই পড়ার। আর তাঁর ছিল গান

শোনার নেশা। কত লং প্লেয়িং রেকর্ড। অনুপম যেন শুনতে পেলেন হেমন্তর সুধাময় সেই কণ্ঠস্বর, বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা। দূর নীলিমায় ওঠে চাঁদ বাঁকা। সন্ধ্যায় সেই গান শোনা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কারণ একটি। গানের সঙ্গে ভেসে আসত নিজের কৈশোর। দাঁড়ের মাঠের বাড়িটা পাকা ছিল। কিন্তু মাথায় ছিল টালি। বারান্দায় বসে গল্প হতো সন্ধের লেখাপড়া শেষ করে। দূরে চাঁদ ভেসে আছে নির্মল আকাশে। সুমি তাঁকে ছুঁয়ে থাকত। অনুপম দৃশ্যটি দেখতে পেতেন হেমন্তর ওই গানের ভিতর দিয়ে। আর সেই লোভেই নেশার মতো উঠে যেতেন অমল সেনগুপ্তর দোতলায়। কুন্তলা জানেইনি। সুমিও না। ওর মা বাবা বাংলাদেশের জমি-জমার সব ব্যবস্থা করে এদেশে বর্ধমানে সব বিনিময় করে আসে ছ'মাস পর। তখন সুমি ফিরে যায় মা বাবার কাছে। বসিরহাট, ২৪ পরগনা, দাঁড়ের মাঠ থেকে বর্ধমান অনেক দূর। সেই যে গেল কিশোরী মেয়েটা, বুড়ি হয়ে ফিরে এল।

অনুপম ইজি চেয়ারে অনেকটা হেলে বসলেন। ল্যান্ড লাইনের রিসিভার ক্রেডল থেকে নামিয়ে রাখলেন। মনে হচ্ছিল শোভন কিংবা সুমিত্রা আবার ফোন করবে। এবার হয়তো সুমিত্রার স্বামীর হাতে ফোন যাবে। সে তার অসুখের কথা বলে যাবে এক নাগাড়ে। না হলে সুমি চুলের কথা বলবে। চুল কবে ঝরে গেল জানে না সুমিত্রা। এখন তো সামান্য আছে। নাকি সুমিত্রার স্বামী বিয়ের পরই চুল কাটতে বলেছিল। বব কাটিং। হাসলেন অনুপম নিজের মনে। অনেক কিছুই হতে পারে। প্রতিটি মানুষ এই পৃথিবীতে এসে কিছু রং আহরণ করে। তারপর সেই রং জ্বলে পুড়ে যেতে থাকে। কেউ কেউ আবার নিজের রং নিজের আলো নিজেই নষ্ট করে। হ্যাঁ, তাই। সুমি নষ্ট করল। তার ছেলে না হয় হোটেলেই থাকত। কী দরকার ছিল ফোন করার? অদ্ভুত! সমস্ত দিন মনে পড়তে লাগল সুমির কথা। এখন কেমন হয়েছে সে? সমস্ত দিন বিরক্ত হয়ে থাকলেন টুটুলের ওপর। টুটুল কেন ফোন নম্বর দিল। তার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল। শোভন ছেলেটা এসে বিরক্ত করবে। সুমি এখন মনের দিগন্তের বাইরে।

সেদিন রাতে আবার সুমি এল। তিনি ঘুমের ভিতরে দাঁড়ের মাঠে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাড়ির পিছনে কটি পেয়ারা, জামরুল, হিমসাগর আম গাছে বাগান মতো। ফনফনে চাঁদের আলো আর বাগানের গাছের ছায়ার ভিতরে তিনি ডাকলেন, কোথায় লুকোলি রে?

আমি আছি গো, কাছেই। তিনি যেন সুমির নিঃশ্বাস পেলেন গায়ের উপর। গরম বাতাসের ভাপ, তোমার বুকের ভিতরে।

কী যে বলিস তুই সুমি। তিনি অন্ধকারে সুমিকে দেখতে চাইলেন, লুকোলি কোথায়?

খুঁজে বের করো বাবলুদা। খিলখিল করে হাসে সুমি।

তিনি পায়ে পায়ে আলো আর ছায়া পার হয়ে যাচ্ছেন। সে চাপা গলায় ডাক দিচ্ছে, ও বাবলুদা, এই বাবলু, বাবলু!

এমন করিস তুই সুমি, কেউ যদি শোনে? কিশোর তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

শুনুক না, আমি কেয়ারই করি না, এই আমাকে দেখতে পাচ্ছ? রিনরিনে গলায় ডাকল কিশোরী, এদিকে এসো না বাবলুদা, এই বাবলু!

অনুপম পার হয়েই যাচ্ছেন ছায়া আর আলো। বাগানে আমের বোল হয়েছে। গন্ধ ভাসছে বাতাসে। দূরে আর সব বালক বালিকা, কিশোর কিশোরীদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। তিনি এগিয়েই যাচ্ছেন, ডাকছেন, কইরে সুমি, আমি চলে যাচ্ছি, এরপর আমাদের খুঁজবে সবাই।

এই তো আছি। চাপা হাসি শুনলেন অনুপম। সুমির হাসি তাঁর ভিতরে শিহরন আনে।

বাগানে ভূত আছে, গাছের ডাল থেকে আলতা পরা পা দুলছে দেখতে পাচ্ছিস? তিনি চাপা স্বরে বললেন।

ইস্‌, মোটেও না, মিথ্যে, তুমিই সেই ভূত। অন্ধকার থেকে সুমি জবাব দিল, তুমি একটা গেছো ভূত।

চুল বেয়ে উঠে আসে তারা অন্ধকার থেকে, তোর চুল সামলা সুমি, তারা চুল খুলে দিয়ে উঠে পড়বে তোর ভিতরে।

কথাটা বলতেই সুমি অন্ধকারের ভিতর থেকে ঝাঁপিয়ে এল যেন। দুই হাতে তাঁকে জাপটে ধরল। যেন এই কথাটির জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। এই ভয়ের বাতাবরণের জন্য সে অপেক্ষা করছিল। আমার খুব ভয় করছে বাবলুদা, তুমি আমাকে সরিয়ে দিও না। দম আটকে আসছিল অনুপমের।

সরে যা, কেউ এসে যাবে। অনুপম বললেন।

আসুক আমি ভয় পাই না, বাবলুদা ছুঁয়ে দেখ আমার বুক কেমন কাঁপছে।

সুমি, আমাদের ডাকছে মা, সকলে মিলে খেলা, আলাদা হয়ে যাওয়া ঠিক না।

কই না তো, কেউ ডাকছে না। সুমি তাঁর বুকে মুখ ঘষতে লাগল।

ছাড়, এত ভয়ের কিছু হয়নি, ছাড় বলছি। অনুপম ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর দম আটকে আসতে লাগল।

না গো বাবলুদা, আমার মনে হচ্ছে কেউ আমার চুল খুলে দিচ্ছে, বাবলুদা! সুমি তার সমস্ত শরীর দিয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরে দম আটকে দিচ্ছে।

॥ পাঁচ ॥

সুমি আবার ফোন করেছে। শোভনও। দুদিন বাদে শোভন না, সুমি একা। সুমি বলছে, বাবলুদা, তোমাকে আমার ছেলে এখানে নিয়ে আসবে। অনেক দিনের সাধ, তোমাকে যত্ন করে রেঁধে খাওয়াই। আসবে তো বাবলুদা? কোচবিহার খুব সুন্দর শহর। রাসমেলায় এসো।

সুমির ফোন আসছে যখন তখন। ক'দিন বাদে মনে হল ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরবেন। মেদিনীপুর শহরে যাবেন। কেন মনে হল? মনে হচ্ছিল, সুমির ছেলের আসার দেরি নেই খুব। সে তাড়াতাড়ি এসে পড়বে। সুমি নিজেই ফোন করে, শোভন করেনি দুদিন। হয়তো আজ রাতেই ট্রেনে চেপে আগামীকাল ভোরে নেমে পড়বে শিয়ালদা। তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন। টুটুল এইটা ঠিক করেনি। টুটুল না জিজ্ঞেস করে ঠিকানা, ফোন নম্বর দিল কেন? এর ভিতরে ওরা ফোন করবে, কিন্তু পাবে না। টুটুল কি তখন তাঁর মোবাইল নম্বর ওদের দেবে? তিনি অচেনা নম্বর ধরবেন না। অনুপমের মনে হল একবার দেখে আসেন। সেই মিশন কম্পাউন্ড, অমল সেনগুপ্তর বাড়ি, তিনি সংসার পেতেছিলেন সেখানে। জীবনের সেই সময়টুকু গিয়েছিল অপূর্ব। তিনি তিরিশ, কুন্তলা বাইশ। কুন্তলার বাপের বাড়ি মগরা। আদি সপ্তগ্রাম পেরিয়ে কুন্তি নদীর ধারে। অনেক পুরনো জনপদ। কুন্তলাদেরও অনেক বড় পরিবার। প্রাচীন দালান কোঠা রয়েছে সেখানে। চুন সুড়কির সেই বুড়ো অট্টালিকা, তার কিছুটা ভেঙেও গেছে। কুন্তলার ঠাকুরদা ছিলেন বড় ভূম্যধিকারী। এদেশি। জমিদার। জমি-জমা ছিল। ভাগ ভাগ হয়ে সব এখন ফুরিয়ে গেছে। এখনও কেউ কেউ থাকে সেখানে। যারা থাকে তাদের না থেকে উপায় নেই। বেরতে পারেনি। ইস্কুলের মাস্টারি, ছোট ব্যবসা এই সব করে কুন্তলার খুড়তুতো, জেঠতুতো ভাইরা। শুধু তার এক দাদা, অমলেন্দু থাকেন সেখানে। তিনি সরকারি চাকরি করতেন, সমস্ত জীবন বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন। অবসরের পর ফিরে এসেছেন নিজের বাড়িতে। কুন্তলার অসুখের সময় তিনি কয়েকবার এসেছিলেন, মৃত্যুর পর যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কুন্তলার আর এক ভাই কমলেন্দু দিল্লিতে সেটলড। মাঝে মাঝে ফোন করে। ইদানীং অনেকদিন কোনও ফোন আসেনি। ছেলের কাছে ম্যানিলা-ফিলিপিনস-এ গিয়েছে হয়তো। অমলেন্দুর এক মেয়ে, বিয়ে হয়ে ভোপালে থাকে। অর্পিতা মেয়েটি ভালো। মাঝে মাঝে তাঁকে ফোন করে। বলে ভোপাল এসো পিসে। পাঁচমারি,

ভীম বৈঠকা, সাঁচি স্তূপ, বিদিশা দেখে যাও। তিনি কুন্তলাকে নিয়ে ঘুরেছেন ওদিকে একবার। কুন্তলার এক মাসি থাকে উজ্জয়িনী। গিয়েছিলেন। তখন হোটেল খরচা করে ঘোরাঘুরি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যখন জীবনটাকে ভোগ করার সময় ছিল, তখন দিন গেছে কঠোর যাপনে। যখন হাতে পয়সা এল, তখন কুন্তলা চলেই গেল। অনুপম তাই যাবেন যাবেন করে কোথাও তেমন যান না। যেতে পছন্দ করেন সেখানেই, যেখানে তিনি কুন্তলাকে নিয়ে গেছেন। দুই সমুদ্র, দীঘা এবং পুরী। উজ্জয়িনী। একবার দিল্লি। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং। আরও কত জায়গা আছে এই ভারতে। তাঁরা শুধু পরিকল্পনাই করতেন। শেষ অবধি যাওয়া হতো না। গেলেও সাঁইথিয়ায় বন্ধুর বাড়ি কিংবা শান্তিনিকেতন। অনুপম ঠিক করলেন বেরতে হবে। অমল সেনগুপ্তর বাড়িতে যাবেন মেদিনীপুরে। গভীর রাতে তাঁর মনে হল, কুন্তলা সেখানে গিয়ে যেন বসে আছে। কিন্তু সেই যে উল্টোদিকের বাড়ির মেয়েটি! তপোমায়া বসু। ইস্কুল টিচার। সেও কি আছে? তাকে সহ্য করতে পারত না কুন্তলা। কেমন গায়ে পড়া ভাব। দাদা দাদা করত। সাহিত্য নিয়ে আলাপ করতে চাইত। সেই তপোমায়া কবিতা লিখত। তাতে কুন্তলা আরও ক্রুদ্ধ হতো যেন। মনে হতো মেয়েটি যেন অনুপমকে অধিকার করতে আসছে। অনুপম বাংলায় এমএ। অনুপম গল্প লিখত কলেজে পড়ার সময়। কিন্তু তা একবার ব্যতীত দু'বার ছাপা হয়নি। ক'বছর প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিজেকে বুঝে বন্ধ করেছিল লেখা। সেই অপূর্ণ সাধ উস্কে দিতে এসেছিল তপোমায়া। মেয়েটি বিয়ে করেনি। করতে পারেনি। অনুপমের মনে পড়ল সেই গৌরী কন্যাটিকে। কুন্তলা সেই সময় খুব সতর্ক হয়ে থাকত। তখন তার পেটে টুটুল এসেছে। অনুপমের মনে হয়েছিল আবার লিখতে আরম্ভ করে। তপোমায়া স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করবে। সে নিজেও একটা ম্যাগাজিন বের করবে ঠিক করেছে। সেই পত্রিকায় অনুপম লিখুক না কেন? না। কুন্তলা না বলায় ইচ্ছে থাকলেও অনুপম লেখেননি। সেই ডায়েরি কি আছে? অনেক বছর বাদে কুন্তলা খুঁজে পেয়েছিল, তখন তিনি সপরিবারে বাঁকুড়ার ন'পাহাড়ি ব্লকে। কুন্তলা তাঁর লেখা গল্প বের করে বলেছিল, 'তোমার লেখা, লিখেছিলে তা বলোনি তো।'

ডায়েরিতে লিখেছিলেন তিনি। সেই ডায়েরি কি নেই এই ফ্ল্যাটের কোথাও? খুঁজে দেখবেন নাকি? কুন্তলা তা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল ন'পাহাড়িতে। কিন্তু নিয়ে আসেনি কি ন'পাহাড়ি থেকে? ন'পাহাড়ি থেকে উত্তরের আলিপুরদুয়ার, সেখান থেকে হলদিয়া, হলদিয়া থেকে বারাসত, বসিরহাট, আলিপুর। আলিপুর থেকে অবসর। ডায়েরির লেখাগুলির প্রতি তাঁর কোনও মায়া ছিল না। কুন্তলার কথায় তিনি মনে মনে দুঃখিত হয়েছিলেন। বিদ্রূপের মতো মনে হয়েছিল। সেই মিশন কম্পাউন্ডে যখন সন্তান এল কুন্তলার গর্ভে, কে যেন তাঁকে বুঝিয়েছিল গর্ভবতী মায়ের মনের যত্নও নিতে হয়। তিনি বুঝতে পারছিলেন তপোমায়ার দাক্ষিণ্যে তার গল্পের প্রকাশ কুন্তলাকে দুঃখ দেবে। কুন্তলার মনে সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি করবে। যা ক্ষতি করতে পারে মাতৃগর্ভে আশ্রয় নেওয়া ভ্রূণের। তপোমায়া অবশ্য কুন্তলার চেয়ে অনেক বড় ছিল। তিনি তখন বত্রিশ পার। তপোমায়া তিরিশ-একতিরিশ। তপোমায়া মা বাবার প্রথম সন্তান। সংসার ঠেলতে হতো। বাবার তেমন আয় ছিল না। দুটি ভাই বড় হচ্ছিল। তারা যখন বড় হয়ে উঠবে, তপোমায়ার বয়স চল্লিশ হয়ে যাবে। এসব তিনি জানতেন। ফলে মেয়েটির প্রতি তাঁর মমতা তৈরি হয়েছিল। তার একটা অবলম্বন চাই। অবলম্বন হল কবিতা। পত্রিকা।

সেই তপোমায়া কি কবি হয়ে উঠেছে? নাকি তিনি চলে আসার পর তার কবিতা চর্চা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি কয়েকটি সাহিত্য সাময়িকী নেন নিয়মিত। দেখেছেন কি না বলতে পারবেন না। অনুপম পরদিন সকালে হাত ব্যাগে পায়জামা, পাঞ্জাবি, শার্ট

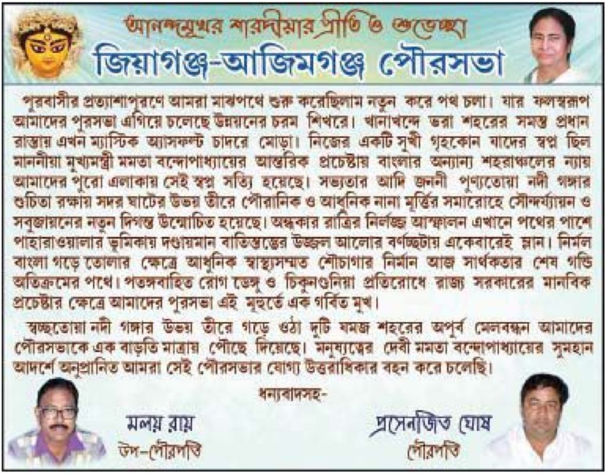

আর দুদিনের ভ্রমণের উপযোগী টুকিটাকি জিনিস নিয়ে দুপুরে বেরিয়ে পড়েন। ধর্মতলা থেকে মেদিনীপুরের অনেক বাস। ৬নম্বর জাতীয় মহাসড়ক এখন আর সেই আমলের 'বম্বে রোড' নেই। ১৯৭৮-এর বন্যায় রাস্তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেই বন্যা হল সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে, তিনি চাকরিতে ঢুকেছিলেন এপ্রিলে। তখন বিয়ে করেননি। লোয়াদা নামে এক গঞ্জে থাকতেন। কংসাবতী নদী সেই গঞ্জের ধারে। সব মনে পড়ে যাচ্ছে। এখন ৬নম্বর জাতীয় মহাসড়ক বিদেশের রাস্তার মতো। মনে হচ্ছে টুটুল যেন এই রাস্তা ধরে সাউথ ক্যারোলাইনা থেকে ওয়াশিংটন সিটি গিয়েছিল, ব্লু রিজ পর্বতমালার পাশ দিয়ে, বাতাসবাড়ি (হাই উইন্ড এরিয়া) আর কুয়াশাবাড়ি (ফগি এরিয়া) ছুঁয়ে। পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়, আর উপত্যকা, বরফে ছেয়ে আছে বনভূমি আর পাহাড়ের গা। সেই কথা বলেছে সে টেলিফোনে। অনলাইন ভিডিও কলিং-এ। বাসের জানলার ধারে তাঁর সিট। বাসটি এসি। জানালার কাচ দিয়ে হাইওয়ের ধারের জনপদ দেখা যাচ্ছে। সন্ধে ছটা নাগাদ মেদিনীপুরে পৌঁছনোর কথা। এই রাস্তার ধারেই আষাঢ়ির মোড়। আষাঢ়িদহ। আষাঢ়িদহের মোড় থেকে বাস ঘুরে যেত লোয়াদার দিকে। হল্কা ক্যাম্প অফিস। জমি জরিপ সেই অফিসের কাজ। ভবানী মাইতি পেশকার আর নিখিল প্রধান গ্রুপ-ডি। আষাঢ়ির মোড় ডান দিকে রেখে অনেকটা গিয়ে ডেবরায় দাঁড়াল গাড়ি। দুজন নামার ছিল। কেউ উঠল না। মেদিনীপুর আর খুব দূর নয়। তিনি কি ডেবরায় নেমে যাবেন? এখান থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে আষাঢ়ির মোড় দিয়ে কংসাবতীর তীরে লোয়াদা। আমিনবাবু সুদাম মণ্ডলের বাড়ি ছিল কংসাবতী পেরিয়ে অনেকটা ভিতরে ত্রিলোচনপুর গ্রামে। তিনি লোয়াদায় জমি কিনেছিলেন বাড়ি করবেন বলে। ১৯৭৮-এর বন্যায় লোয়াদাও ভেসেছিল। কংসাবতীর কী রোষ! ডিসেম্বরের আরম্ভেই ২২ অঘ্রান ভবানী মাইতি আবার একটি বিয়ে করল। আগের পক্ষকে ফেলে এসেছিল পুরুলিয়া। কী সব মানুষ! কী তাদের সাহস! তখন সে চল্লিশ পার। মনে পড়ে যাচ্ছিল অনুপমের। ভবানী খুব ধার করত। শেষ অবধি ধার রেখে পালিয়েছিল শেষ রাতে বউ আর আগের পক্ষের মেয়ে নিয়ে। বদলির আদেশ করিয়েছিল হেড অফিস থেকে। সুদাম লোয়াদাতেই বাড়ি করেছিল। তাকে খুঁজে পাবেন না তিনি? এখন যদি যান, সুদাম কি তাঁকে চিনতে পারবে না? তাঁরই বয়সি ছিল। শুনেছেন কংসাবতীর ওপারে ব্রিজ হয়ে গেছে। একবার সুদাম তাঁকে তার বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। সাত মাইল রাস্তা মাটির। কোথাও খোয়া পড়েনি পর্যন্ত। বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা। পিছল। অগম্য হয়ে যায়। তিনি গিয়েছিলেন সুদামের সাইকেলের পিছনে বসে। বড় গৃহস্থ। অনেক জমি। মাটির দোতলা। ইট পুড়বে শীতের সময়। তার বাবা বললেন, দালান করবেন। আরও কী কী বলেছিলেন, সব মনে নেই। তবে বিয়ে করেছে কি না অফিসার সাহেব তার খোঁজ নিয়েছিল। সুদাম পরদিন ভোরে তাঁকে নিয়ে রওনা হয়েছিল পাঁশকুড়ার দিকে। সোজা ঘাটাল দাসপুরের দিকে কংসাবতীর আর এক শাখার বাঁধের রাস্তা ধরে গ্রাম আর গাছ-গাছালির ছায়া আর রৌদ্রের ভিতর দিয়ে কী অসামান্য ছিল সেই যাত্রা। সুদাম তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল স্টেশনে। তিনি কলকাতা এসেছিলেন। এই কথাটি বললে কি সুদাম তাঁকে চিনবে না?

বাস ছুটছিল। চোখ জুড়িয়ে আসছিল। সুদামের কি মনে আছে, পথে তাঁরা দেখেছিলেন একটি স্বর্ণগোধিকা। হলুদ। কাঁচা সোনার মতো তার রং। সুদাম বলেছিল, স্বর্ণগোধিকা দেখা মানে সৌভাগ্যের সূচনা, কালকেতু একে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে।

মা লক্ষ্মী।

তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন। বাঁধের রাস্তার নীচে একটি জলাশয়। তার পাড়েই শুয়েছিল সে। তখন শরৎকাল। কাঁচা সোনার মতো উজ্জ্বল হলুদ ছিল তার সর্বাঙ্গ। তার উপরে পড়েছিল আশ্বিনের রোদ। নিস্পন্দ ঘুমের ভিতরে ছিল বুঝি সে। অনুপম দেখেছিলেন অতুল ঐশ্বর্য স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে পড়ল। সুদাম বলল, স্যার, আপনিই তো দেখেছিলেন প্রথম।

হ্যাঁ, কিন্তু তেমন সৌভাগ্য কিছু হয়নি, সমস্ত জীবন খুব কষ্ট করেছি।

কেন আপনার পুত্র বিদেশে, মেয়ের ভালো বিয়ে হয়েছে।

কুন্তলা যখন সুখের মুখ দেখবে, তখন অসুখে পড়ল, চলেও গেল।

স্যার, আপনাকে আমি চিনেছি দেখা মাত্র।

সুদাম তুমি খুব বুড়ো হয়ে গেছ।

নানা অসুখ আমাকে খেয়ে ফেলেছে, বুকে মেশিন বসেছে, পেস মেকার।

ছেলে মেয়ে?

মেয়ের বিয়ে দিয়েছি ঘাটালে, জামাই পি ডব্লু ডি-তে সরকারি চাকরি করে, খুব ঘুষ খায়, সাসপেন্ড হয়ে গিয়েছিল, বারণ করলে শোনে না।

ছেলে? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

সুদাম চুপ করে থাকে। অন্ধকারের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। ছেলে রাজনীতি করে। দল বদল করেছে ন'মাস আগে। অনেক পয়সা করেছে। মেদিনীপুরে বাড়ি, গাড়ি। খুব মোটা হয়েছে। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি এঁটে থাকে। ছেলে টাকা দিতে চায়। সুদাম নেয় না। তার পেনশন আছে। বউ খুব ভালো। তাঁকে খুব যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখেছে। শুনতে শুনতে তিনি বললেন, আমি পারিনি, সুদাম এখন কাঁসাইয়ে জল নেই?

না স্যার, জলের শব্দ শুনতে পেতেন তাহলে।

অন্ধকারের নদীর দিকে তাকিয়ে তাঁর সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। স্বর্ণগোধিকা টের পেয়েছিল তাঁদের উপস্থিতি। সরসর করে নেমে গিয়েছিল জলে। এখন মনে হয় আর কিছু সময় শুয়ে থাকলে সে হয়তো মা লক্ষ্মীর রূপ ধারণ করত। স্বর্ণকমল হাতে পদ্মাসীনা দেবী। মা কমলা। সুদাম বলল, কোনও মানুষের জীবনেই সব ভালো হয় না স্যার, সুখ দুঃখ নিয়েই তো জীবন।

সেই ভবানী মাইতি, পেশকারবাবু? জিজ্ঞেস করলেন অনুপম।

শুনেছিলাম তার দ্বিতীয় পক্ষ তাঁকে ছেড়ে পালিয়েছিল,শেষ জীবন খুব কষ্টে গেছে।, পরে আর একটা বিয়ে করেছিল তমলুকে। সুদাম বলে।

লোকটা যেখানে যেত বিয়ে করত, যেন নিয়তি-তাড়িত মানুষ, হাতের লেখা সুন্দর ছিল, কথা বলত ভালো। অনুপম বললেন।

ওর পাশে কেউ ছিল না শেষজীবনে, ভিখিরি হয়ে মরেছিল নাকি। সুদাম বলে।

নিখিল প্রধান? জিজ্ঞেস করতে করতে সেই ভাঙাচোরা মানুষটির মুখ মনে পড়ল অনুপমের। খুব অভাবী ছিল। রাতে মুড়ি খেয়ে থাকত অনেকদিন। জীবনের আরম্ভে একসঙ্গে মেস করে থাকা হতো সেই গঞ্জে। জরিপের কানুনগো, আমিন, মোহরার, পেশকার, পিয়ন...সবাই। নিখিল প্রধান সকলের নীচে। ডি-গ্রুপ কর্মচারী, বয়স তখন পঞ্চাশ। কাঁথির দিকে গ্রামে মস্ত সংসার। সারামাস গ্রামের বাবুবাড়ি থেকে চাল ডাল, নারকেল, এটা ওটা সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে যেত। ঘুমের ঘোরে কাঁদত। অনুপমকে 'বাবু' বলত। যেন অনুপমবাবু আর সে ছিল তার বাঁধা মুনিষ।

কাঁথিতে চলে গেল বদলি হয়ে, আর জানি না স্যার। সুদাম বলল।

নিখিল প্রধান রাত্তিরে কাঁদত, তুমি জানো?

জানি না স্যার, মেসে তো আমি ছিলাম না, খুব অভাবী মানুষ ছিল জানি, হেঁটে ত্রিলোচনপুর গিয়ে আমার বাবার কাছ থেকে নারকেল, আম নিয়ে এসেছিল একবার, তা বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, মুড়ি আনত মায়ের কাছ থেকে।

এখন কি বেঁচে আছে?

জবাব পেলেন না তিনি। অন্ধকারের নদী পার হয়ে বাতাস আসছিল। সেই গোলগ্রাম, করণ্ডা, ত্রিলোচনপুর, সোনামুই, কাটাগেড়্যা, বগলাশুনি...। এই জীবনের এক এক বিন্দু সেখানে ফেলে এসেছেন যেন। বাস যখন মেদিনীপুর পৌঁছল, সন্ধে হয়ে এসেছে। স্টেশনের কাছে একটা বোর্ডিং হাউস ছিল। আর ছিল আবাসিক হোটেল। তিনি বাস টারমিনাসে নেমে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন চারদিকে। এ যেন অন্য শহর। এত আলো, এত হাঁকডাক এই শহরে এই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়, তা অভাবিত। সেই শান্ত, নির্জন শহর, বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির পথ, রিকশর টিং টিং শব্দ..., লোহার একট দণ্ড রিকশর হ্যান্ডেলে বাজিয়ে বাজিয়ে সে শহর ভেদ করতে লাগল। মনে হচ্ছিল নতুন কোনও শহরে এসেছেন। রিকশয় উঠে বললেন মিশন কম্পাউন্ড চেন? বার্জ টাউন?

চিনি। রিকশওয়ালা বলল।

তিনি বললেন, আগে হোটেল, ভালো হোটেল, কাল ভোরে যাব।

আচ্ছা স্যার।

রিকশ চলল। তাঁর মনে হল পথে তপোমিতাকে দেখতে পাবেন। তপোমিতা আর কুন্তলা হাসতে হাসতে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির দিকে হাঁটছে। কী বই? পার লাগেরকভিস্টের বারাব্বাস। দুজনেই বারাব্বাস পড়বে। আচ্ছা হেড না টেল? এমন কি হয়েছিল কোনওদিন? হয়েছিল প্রথমে। নাকি হয়ইনি। তিনি হাসলেন নিজের মনে। শহরে অনেক মানুষ। এই শহরে কি তাঁর কোনও বন্ধু আছে? একটা লোক, দেবেন মল্লিক, তার বাড়ি এই শহরেই। দেখা হয়েছিল বাঁকুড়ায়। দেবেন খুব রাজনীতি করত। শাসক ঘনিষ্ঠ। সে তাঁকে খুব বিপদে ফেলেছিল। শাসক দলের সমর্থক ইউনিয়নে মাথা মুড়োতে বলেছিল। তিনি চুপ করে থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তৈরি করে মেরুদণ্ডহীন উপরওয়ালাকে দিয়ে কারণ দর্শানোর চিঠি দিয়েছিল, কেন তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা হবে না। সেই দেবেন মল্লিক এই শহরে মস্ত দালান করেছে গ্রাম থেকে উঠে এসে। দেবেনের মুখেই তা শুনেছিলেন তিনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন রিকশওয়ালাকে, দেবেন মল্লিকের বাড়ি চেন?

কোন দিকে?

তিনি বললেন, মহুয়া সিনেমার দিকে হবে হয়তো।

দেখলে চিনতে পারব, ফোন করেন, জিজ্ঞাসা করেন কোন বাড়ি, কত নম্বর, বাড়ির রং কী?

তিনি বললেন, তা তো বলতে পারব না ভাই।

কাল সকালে হুইসল ফুকে দেব ছার, এখন খুঁজি লাভ নেই। রিকশওয়ালা হাসতে হাসতে বলল।

॥ ছয় ॥

রিকশ চলছিল। তিনি যা চাইছিলেন তা ঘটে যাচ্ছে আজ। তিনি দেখতে পেলেন দেবেন মল্লিকই। হ্যাঁ, দেবেন। রাস্তার ধার দিয়ে হাঁটছে। আগের মতোই আছে। সেই রকম মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, চারদিক দেখতে দেখতে, সেই ঔদ্ধত্য নিয়ে যেন চারদিকে কেউ কিছুই নয়, সে নিজেই সব । তিনি ডাকতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন। দেবেন সাড়া দেবে তো? চিনতে পারবে? তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ছিল লোকটা। কিন্তু সার্ভিসে একই সময়ের। ডাক দিলেই বলবে, তুমি কি আছ আমার ইউনিয়নের সঙ্গে? না থাকলে তোমার অসুবিধে হবে। তোমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে। সবচেয়ে দূরে বদলি হয়ে যাবে। আর আমার ইউনিয়নের মেম্বার যদি হও, কলকাতায় বলো, বারাসত, আলিপুর যেখানে হয় পোস্টিং পেয়ে যাবে। তিনি আলিপুরদুয়ার, ডুয়ার্স গেলেন ন'পাহাড়ি থেকে। তখন কত কাছে ছিল সুমি। জানতেন না। আলিপুরদুয়ার থেকে একঘণ্টায় গিরিডাঙা শহর কিংবা গঞ্জ। ওদিক তাঁর চেনা, কোচবিহারের রাসমেলা তিনি দেখেছেন। মদনমোহন মন্দির, রাজবাড়ি, রসিকের বিল, আর সেই জল্পেশের মন্দির। সুমিকে বলবেন তিনি, না বলবেন না? পরে ভাবা যাবে। দেবেন কই, দেবেনদা?

তিনি দেখতে পেলেন না আর দেবেনকে, কোন দোকানে ঢুকে ভ্যানিশ। তখন সামনে একটি রিকশ চলে গেল তাঁর রিকশ অতিক্রম করে। অমল সেনগুপ্ত। হ্যাঁ, তিনি। সেই শীর্ণকায় প্রবীণ। পাশে মানসী সেনগুপ্ত। বৃদ্ধ কী সুন্দর ডাকতেন, মানসী শুনছ? মানসী তুমি একটু গান শোনাবে শচীনদেব বর্মণের! কতদূর চলে গেল রিকশ। আহা কৌন হে তেরা মুসাফির জায়েগা কাঁহা? তিনি অন্ধকারের শহর পার হয়ে যেতে লাগলেন ক্রমাগত। আলো নিভে রয়েছে রাস্তার। লাইন গেছে। এমনি হয় না এখন, কিন্তু হয়েছে আজ। রিকশওয়ালা বিড়বিড় করতে থাকে, অন্ধকার হলি গা-গেরামে অসুবিধে নেই, কিন্তু শহরে খুব ঝামেলা।

হোটেলটি ভালো। তখন এত ভালো হোটেল ছিল না এই শহরে। ক্লান্ত বোধ করছিলেন অনুপম। খেয়ালে চলে এসেছেন। ভিতরে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে চা আর কিছু স্ন্যাক্স নিয়ে টেলিভিশন দেখছিলেন। রাত আটটা। তাঁর চোখ জড়িয়ে আসছিল। বাস-জার্নি ক্লান্ত করেছে খুব। রাত নটায় ডিনার আসবে, তিনি কি ঘুমিয়ে নেবেন একটু? বিছানায় টান টান হলেন। ঘুমে তলিয়ে যেতে লাগলেন। তখনই ফোন বাজল। ভবতোষ। স্যার, আপনি কোথায়?

কে জানে কেন, ভবতোষের ফোন না কেটে রিসিভ করলেন তিনি। এই ডাক এখন ঘুম তাড়াবার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি বললেন, কেন কী দরকার?

দুপুর থেকে আপনাকে দেখিনি, রাতে রুটি নিতে আসেননি, আমি আপনার ফ্ল্যাট অন্ধকার দেখছি।

অনুপম বললেন, আমি ফ্ল্যাটে নেই।

কোথায় স্যার? ভবতোষ জিজ্ঞেস করে।

কেন, কী দরকার? বিরক্ত হলেন অনুপম।

চাবি আমার কাছে রেখে যেতে পারতেন, আপনি যদি বলেন স্যার আমি নিয়ে আসতে পারি। ভবতোষ বলল, অতবড় ফ্ল্যাট অন্ধকার থাকবে স্যার, আমিই না হয় রাত্তিরে থাকতাম, বাড়ি খালি রাখতে নেই।

দরকার নেই। বলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ভবতোষবাবু আপনারা ক'ভাই?

কেন স্যার?

দরকার আছে, বোন ক'জন?

আমি কি বলিনি আপনাকে? ভবতোষ বলল, সবই বলেছি আপনাকে।

ভুলে গেছি। বললেন অনুপম।

আপনি কবে ফিরবেন স্যার? ভবতোষ প্রসঙ্গ বদলে নিজের কথায় ফিরে আসে।

দেরি আছে। বললেন অনুপম।

কেউ যদি আসে, কী বলব? ভবতোষ জিজ্ঞেস করলেন।

চমকে ওঠেন অনুপম, জিজ্ঞেস করেন, কেউ মানে, কে আসবে?

আপনার আত্মীয়-স্বজন।

আমার আত্মীয়-স্বজন কি না বলে আসবে, ফোন তো করবে। অনুপম বললেন।

সারপ্রাইজ দিতে কি কেউ আচমকা চলে আসে না?

না, সারপ্রাইজের দিন চলে গেছে। বললেন অনুপম, ফোন করেই আসে, লোকে কোনও রিস্ক নেয় না।

ল্যান্ড লাইনে করলে তো পাবে না স্যার। বলল ভবতোষ।

কেউ এসেছে? কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন অনুপম। তারপর এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ভবতোষ আন্দাজে ঢিল মারছে। যে-ই আসুক ফোন না করে তো আসবে না। শোভনের কাছে

তাঁর নম্বর আছে। টুটুল দিয়েছে। কিন্তু ওরা তো সত্যিই ল্যান্ড লাইনে ফোন করে। মোবাইল নম্বর কি জানে না? পেতে কত সময়! ভবতোষ বলল, আপনি না বলে কোথায় গেলেন স্যার?

কাকে বলব?

ভবতোষ বলল, পাড়ায় বলে যাবেন, সিকিউরিটিও জানে না কিছুই, আমরা কি আপনার কেউ নই স্যার?

অনুপম ঘড়ি দেখলেন, আরও মিনিট কুড়ি আছে ডিনার আসতে। কথা চালিয়েই যাওয়া যায়। কিন্তু ভবতোষের ফোনের বিল উঠছে তো। ফ্রি কল আছে নাকি? আজকাল প্রতিযোগিতায় নেমে কত মোবাইল কোম্পানি কত রকম সুবিধে দিচ্ছে। ভবতোষ বলল, অনেক দূরে গেছেন স্যার, আপনার মায়ের কাছে দাঁড়ের মাঠে?

আপনি তাও জানেন?

ইয়েস স্যার, মা আছেন, ছোটভাই মারা গেছে, বসিরহাটে মেজ ভাই।

লোকের অন্দরমহলের খোঁজ নেওয়া ভালো অভ্যাস নয়, আপনাকে খবর দিল কে?

ভবতোষ বলল, খবর সব পেয়ে যাই স্যার, আপনি কি মেয়ের কাছে সিউড়ি গেছেন, শান্তিনিকেতন?

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, আর কোথায় যেতে পারি?

ভবতোষ জিজ্ঞেস করল, কবে ফিরবেন স্যার?

বলতে পারছি না, দেরি হবে। ভবতোষকে হতাশ করে বললেন তিনি।

আমাকে চাবিটা দিয়ে গেলে আমি ফ্ল্যাট দেখতাম স্যার, যখন আমেরিকা যাবেন আমাকে দিয়ে যাবেন স্যার চাবি, মানুষ না থাকলে বাড়ি ঘর নষ্ট হয়ে যায়, স্যার ডিনার হয়েছে?

অনুপম জবাব দিলেন না। সঙ্গে করে ওষুধ নিয়ে গেছেন তো স্যার? ভবতোষ জিজ্ঞেস করল।

কী ওষুধ? অনুপম আর অবাক হবেন না যদি ও সব হুবহু বলে দিতে পারে। হ্যাঁ, জানে সব। প্রেশারের ওষুধ, প্রস্টেটের ওষুধ এবং হার্টের একটি ইকো স্পিরিন জাতীয় ওষুধ, ঘুমের জন্য ট্রাঙ্কুলাইজার। যে ওষুধের দোকান থেকে তিনি ওষুধ নেন, সেখান থেকেই খোঁজ নিয়েছে হয়তো। লোকটাকে কি টুটুল লাগিয়ে দিয়েছে তাঁর পিছনে? খোচড়। টুটুল হয়তো ওকে কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করেছে। তিনি বললেন, রাখছি।

কোথায় আছেন বললেন না স্যার। ভবতোষ জিজ্ঞেস করল।

অনুপম ফোন কেটে দিলেন। চুপচাপ শুয়ে থাকলেন। টেলিভিশনের সাউন্ড মিউট করা আছে। বিজ্ঞাপনের প্রবাহ দেখা যাচ্ছে। স্প্যাগেটি পরা এক তরুণী তার মাথাভরা অনেক অনেক চুল ভাসিয়ে দিচ্ছে মস্ত ঘরে। শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন। তিনি চমকে উঠলেন, সুমি। একেবারে সুমি। তিনি উঠে বসলেন। সুমি বলল, এই দেখো আমার চুল, ও বাবলুদা, বাবলুদা।

অনুপম চুপ করে তাকিয়ে আছেন। কেশবতী কন্যার চুল উড়ছে মেঘের মতো। অনাবৃত কাঁধ, বুকের ভাঁজ দেখা যাচ্ছে। তিনি বিস্ফারিত চোখে বিজ্ঞাপনের মেয়েকে দেখতে দেখতে চোখ বন্ধ করলেন। সুমি এমনি ছিল। তিনি দেখেছিলেন সুমিকে। সুমিই অনাবৃত করেছিল বুক। এমনি না, এর চেয়েও উদ্দীপক। অন্য রকম? চোখ খুললেন। সুমি আছে। সুমি হাসছে। অলিভ অয়েলের বিজ্ঞাপন। মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপন, সুমির মুখ। টিভির পর্দা জুড়ে সুমির মুখ। সুমি বলত সে হিরোইন হবেই। আশা পারেখ। আশা পারেখের মতো পুরুষ্টু ঠোঁট ছিল সুমির। তিনি বন্ধ করলেন চোখ। তখন ফোন বাজল। আবার ভবতোষ? লোকটা তাঁকে বিব্রত করেই যাবে। একা হতে দেবে না। কিন্তু না। অচেনা নাম্বার। তিনি ধরবেন, না ধরবেন না করেও ধরলেন। সুমি। সুমির কণ্ঠস্বর যেন আছড়ে পড়ল। বাবলুদা, বাবলুদা...। বাবলুদা আশা পারেখ বেঁচে আছে বাবলুদা? তিনি ফোন কেটে দিলেন। সুইচড অফ। মোবাইল নম্বর কী করে পেল সে? ফোন এসেছিল কি? তিনি কি সুমির কণ্ঠস্বর শুনেছেন? যে হোক, তিনি ফোন বন্ধ রাখবেন। একা মানুষ, ফোনে কী হবে? কিন্তু ভবতোষ তাঁর মেয়েকে বলতে পারে তিনি ফ্ল্যাটে নেই। মেয়ে তখন খোঁজ নিতে আরম্ভ করবে। ফোন বন্ধ রাখলে পুলিসে খবর দেবে। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রুম সার্ভিস বলা ছিল। কিন্তু তা বাতিল করলেন নিজে নিজে। ডাইনিং রুমে প্রবেশ করতে ওয়েটার চলে এল, এবার যাচ্ছে স্যার, রুমে যাবে তো?

অনুপম বললেন, না, দরকার নেই, এখানেই দেবেন।

ডাইনিং রুমে অন্তত জনা সাত লোক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছে তাঁকে। যেন সকলেই অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। তিনি আসতে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তিনি খালি টেবিলে বসেছেন। অপেক্ষা করছেন। একজন ঢুকল। তাঁর চোখ ডাইনিংয়ের প্রবেশ দ্বারে। লোকটি শীর্ণকায়, মাথাভরা কাঁচাপাকা চুল। চেক হাওয়াই শার্ট আর কটন প্যান্ট। চোখে চশমা। বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে। কত ওপরে? তাঁর বয়সের নাকি? হতেও পারে। তিনি দেখলেন লোকটি তাঁর টেবিলের দিকে এগিয়ে এল, বসতে পারি?

তিনি ঘাড় কাত করলেন। চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন ফাঁকা ডাইনিং রুম। কত টেবিল ফাঁকা। লোকটি যে কোনও টেবিলেই বসতে পারত। কিন্তু না বসে, তাঁর সামনে। তাঁকে দেখছে। জিজ্ঞেস করল, আর কেউ আসবে?

অনুপমের কী মনে হল, বললেন, কথা ছিল, আসেনি এখনও।

কত নম্বর রুম, ইন্টারকমে ডেকে নিতে পারতেন।

না, এই শহরে আজ আসার কথা, এই হোটেলে।

শীর্ণকায় লোকটি বলল, এখনও আসেননি তিনি?

অনুপম বললেন, এখনও না, তবে আসার সময় যায়নি।

শীর্ণকায় বলল, আমার ঠিক উল্টো, আমি এসেছি, আর তিনিও।

অনুপম হাসলেন, বললেন, উল্টো নয় সোজা, তিনি কে? অনুপম জিজ্ঞেস করতে করতে বুঝতে পারছিলেন, তিনি যেমন বানিয়ে বলছেন, ইনিও।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, কবে কথা হয়েছিল?

এই তো কদিন আগে, তাঁকে আমি দেখিনি কোনওদিন, কিন্তু শুনলাম তিনি আমার কাছে আসবেন আমাকে দেখতে। শীর্ণকায় জবাব দেয়।

শুনতে শুনতে অনুপমের মনে হয় কথাটা যেন খুব চেনা। কিছু কথা বহু বার বলা হলেও অচেনা হয়েই থাকে। আর কিছু কথা প্রথমেই চেনা মনে হয়। কথার ভিতরে যে কথারা থাকে তারা যেন আত্মীয়-স্বজনের মতোই থেকে যায়। অনুপম বললেন, তাঁকে কী করে চিনবেন?

আমি মনে মনে ভেবে নিয়েছি তিনি কেমন, একটা আদল আছে আমার কাছে, মিলে গেছে।

অনুপমের গা শিরশির করে ওঠে, প্রসঙ্গ বদলাতে চাইলেন, বললেন, অনেক বছর আগে এই শহরটা যেমন ছিল তেমন নেই তো।

না নেই। বলল শীর্ণকায়, অনেক বছর আগে আমিও এমন ছিলাম না, আপনিও না, আপনি আমাকে চিনতেন না, আমিও না, এই কদিন আগেও না, তো শহরে অনেক কিছুই নতুন তো হবেই।

এই হোটেল ছিল না। অনুপম বললেন।

শীর্ণকায় বলল, না ছিল না।

তাহলে এই হোটেলে সে আসবে কী করে?

তাহলে আপনার গল্প ভুল। শীর্ণকায় বলল।

কিন্তু আপনার গল্প? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

শীর্ণকায় মৃদু হাসে। জবাব দেয় না। অনুপম জানেন, আসলে এমন একটি গল্প আছে। সেই গল্পে বাল্যকালে দুই বালকের তারিখ ঠিক করা ছিল। বিশ বছর পরে তাদের দেখা হবে কোথাও।

দেখা হয়েছিল সেই পরিণত বয়সে। বিশ বছর বাদে তাদের একজন খুনী, অন্যজন সন্ত। জীবন এমন-ই।

॥ সাত ॥

কথা চলছিল থেমে থেমে। দুই বাক্যের ভিতরে শান্ত নীরবতা ঢুকে পড়ছিল। সময় নিয়ে শীর্ণকায় বলল, গল্প হলে চলে আসত, গল্প নয় বলে এমন কিছু ঘটতে পারে না, গল্পেই এসব ঘটে। একজন খুনি হয় অন্যজন সাধু।

অনুপম মানুষটিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম?

শীর্ণকায় বলল, আমি বিজনকুমার সিংহ, আমার বাড়ি খুব দূরে নয়, শালবনি।

শালবনি! অনুপম স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন, কে বিজনকুমার সিংহ? কন্যা বুবুলকে বলেছিলেন, শালবনিতে যাবেন বন্ধুর বাড়ি। বন্ধুর নাম বিজনকুমার সিংহ। লোকটা খুব পড়ুয়া। বইয়ের সংগ্রহ ছিল অতুল। লোকটা তবু একটি খুন করেছিল। সেই উপন্যাসটির নাম, 'ঘাতক'। পপুলার নভেল ঠিক নয়। অনেক জটিলতা ছিল তার ভিতরে। সেই বিজন! তাঁকে চিনে তাঁর সামনে এসে বসেছে। শীর্ণকায় আচমকা উঠল, স্যরি, আমি ফোন ফেলে এসেছি, কল আসতে পারে। বলতে বলতে লোকটি, যে ছিল আসলে এক প্রকৃতিপ্রেমী কিন্তু খুন করতে বাধ্য হয়েছিল, সে উঠেই যায়। যাকে খুন করেছিল সে একজন পাপী। দিনের পর দিন একটি ফুলের মতো মেয়েকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করত। তিনি বললেন, ঘাতক বিজনকুমার সিংহ, বসুন ফোন আসবে না। ঘাতক বিজনকুমার সিংহ বলল, আমি ঘাতক নই, আমি পরিত্রাতা, ঘুরে আসি।

আপনি আর আসবেন না। অনুপম বললেন।

কে বলল আসব না? লোকটি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, সেই মেয়েটি কোথায়?

কার কথা জিজ্ঞেস করছেন?

সেই মেয়েটি, কী নাম ছিল যেন, নাতাশা।

চুপ করে থাকে লোকটি। তারপর বলল, আমি জানি না, তার কথা তো আর লেখেনি লেখক।

আজ এখানে কার আসার কথা?

তাঁকে আমি চিনি না, কিন্তু তিনি আসবেন।

অনুপম চুপ করে থাকলেন। গোয়েন্দা বলেছিল, মেয়েটি হয়তো আত্মহত্যা করত, লোকটির মৃত্যুতে সে বেঁচেছিল। বিজনকুমার সিংহ তাকে রক্ষা করেছিল। বিজন লোকটিকে খুব ভালো চিনত। মেয়েটিকেও। মেয়েটি ভাউচারে পেমেন্ট পাওয়া কম্পিউটার অপারেটর। লোকটি অফিসের সর্বময় কর্তা। লোকটি মেয়েটির চাকরি পাকা করে দেবে বলে তাকে দিনের পর দিন, সেই ছবি তুলে, দিনের পর দিন তাকে বাধ্য করত...। শেষে মেয়েটি সব বলে বিজনকুমার সিংহকে। বিজন সিংহ লোকটিকে হত্যা করে মধ্যরাতে এক বাংলোয় হানা দিয়ে। বিজনকে চিনতই না অফিসের কর্তা। মেয়েটিও জানত না বিজনকুমার সিংহ ঘটিয়ে দিতে পারেন এমন ঘটনা। গোয়েন্দা তদন্ত করতে করতে পৌঁছে গিয়েছিল প্রকৃতিপ্রেমী বিজনকুমার সিংহর কাছে। সমস্তটা জেনে পুলিস কেস ফাইল চাপা দিয়ে দিয়েছিল। ভালো লোকটাকে আর গ্রেপ্তার করেনি। কিন্তু এ হল গল্প। রহস্য উপন্যাস। এই সত্য কি জীবনে ঘটতে পারে? শালবনি এই শহর থেকে বাসে একঘণ্টার পথ। যাবেন কি? গিয়ে কী হবে? বিজনকুমার কি সত্যি? লোকটা চলে যেতে লাগল। ওয়েটার ডিনার নিয়ে এল। সাজিয়ে দিতে লাগল টেবিলে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, যিনি গেলেন, তাঁর কত নম্বর রুম?

কার স্যার? ওয়েটার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কে গেলেন?

ওই বিজনকুমার সিংহ কত নম্বর রুমে উঠেছেন?

কোন গেস্ট স্যার?

এই যে এখানে বসে ছিলেন?

কখন? জিজ্ঞেস করল ওয়েটার।

এখনই, তুমি এলে আর তিনি গেলেন, তোমার পাশ দিয়ে তো বেরিয়ে গেলেন!

কই গেলেন? বিস্মিত হয়ে ওয়েটার তাঁকে দেখছে।

বিস্মিত হতে হতে বিস্ময় সংবরণ করলেন অনুপম। চুপ করে গেলেন। ওয়েটার কথা বাড়াল না। তাঁর দিকে তাকাতে তাকাতে ফিরে গেল। ডিনার শেষে তিনি রিসেপশনে গেলেন। দুষ্কৃতী হানায় কতজন গ্রামবাসী মারা গেছে ছত্তিশগড়ে তা নিয়ে টিভিতে খবর হচ্ছে। একজন সরপঞ্চ মারা গেছে গত সপ্তাহে। মাওবাদী অ্যাকশন। তারপর পাহাড়তলির একটি গ্রাম আগুনে ভস্মীভূত। সালোয়া জুড়ুম না মাওবাদী, না আধা সামরিক বাহিনী মাওবাদী খুঁজতে গিয়ে এই কাজ তা ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু গ্রাম পুড়ে ছাই। তিনি দেখলেন কিছু সময়। গাছ পর্যন্ত পুড়েছে অনেক। ওই অঞ্চলে অনেকদিন বৃষ্টি নেই। অগ্নির অপেক্ষায় ছিল যেন গ্রামটি আর তার লাগোয়া বনভূমি। বনভূমিতে আগুন লেগেছে কারণ বনের ভিতর রাষ্ট্রদ্রোহীরা আত্মগোপন করে থাকতে পারে। তিনি রিসেপশনে বসা যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, বিজনকুমার সিংহ কোন রুমে আছেন?

নামটি একবার জিজ্ঞেস করে রিসেপশনিস্ট কম্পিউটার সার্চ করে বলল, এই নামে তো কেউ নেই স্যার।

তিনি সরে এলেন। একা ফিরলেন নিজের ঘরে। ফিরতে ফিরতে মনে হচ্ছিল লোকটি আছে। হোটেলের সব ঘর ভিতর থেকে কিংবা বাইরে থেকে বন্ধ। বিজনকুমার সিংহ আছে হয়তো কোথাও। নাকি সে চলেই গেছে, তার সঙ্গে যার দেখা হওয়ার কথা তা হয়ে যেতে। ঘরে ঢুকে বিছানায় কাত হয়ে ভাবছিলেন, তাহলে বিজনকুমার সিংহর সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার কথা ছিল এই শহরে। আর বিজনকুমারেরও তাই। দেখা হয়ে গেছে। আর দেখা হবে না। গল্পটা মিলে গেছে। এমন একটা কথা ছিল হয়তো। কথাটি জন্ম নিয়েছিল নিজের মেয়ে বুবুলের সঙ্গে বাক্যালাপের সময়। বুবুলকে তিনি বানিয়ে বলেছিলেন, শালবনিতে যাবেন বন্ধু বিজনকুমার সিংহর কাছে। বিজনকুমার সিংহ কে? বুবুল বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। আজ যেন সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। আসলে সমস্তটাই তাঁর কল্পনা। একা জীবনে কত রকম মায়া আর পরাবাস্তবতা জন্ম নেয়।

পরদিন সকালে গত সন্ধ্যার সেই রিকশওয়ালা এল। তাকে নিয়ে তিনি শহর পরিক্রমায় বেরলেন। রবিবার। শহরের ঘুম যেন দেরিতে ভেঙেছে। রিকশওয়ালা হ্যান্ডেলের গায়ে লোহার কাঠি বাজাতে বাজাতে চলল। লোকটি অদ্ভুত। মাঝে মাঝে জামার বুক পকেট থেকে একটি হুইসল বের করে বাজিয়ে চারপাশে জানান দিচ্ছে। অনুপম আপত্তি জানাতে সে বলল, দেবেন মল্লিকবাবু জানুক আপনি আবার ফিরে এয়েছেন। যাবেন স্যার মৌহা সিনিমা হলের দিকে। হুইসল মারলেই মল্লিকবাবু বেরিয়ে আসবে ঘর থেকে। বনবন করতে করতে রিকশর চাকা ঘুরতে লাগল। ছুটতে লাগল রিকশ। তিনি রিকশওয়ালাকে মিশন কম্পাউন্ডের কথা বললেন। রিকশ ছুটল মিশন কম্পাউন্ডের দিকে। কিছুই চেনা যাচ্ছে না। সব আলাদা। সেই মিশন কম্পাউন্ড আর এখনকার মিশন কম্পাউন্ডে কোনও মিল নেই। একেবারে আলাদা। চার্চটি আছে। তা বাদে কত ঘর কত বাড়ি। সেই পুরনো নিঝুমতা আর নেই। কোথায় যাবেন স্যার? জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণকায় যুবক রিকশওয়ালা। অমল সেনগুপ্তর নাম করতে সে মাথা নাড়তে লাগল। তারপর জিজ্ঞেস করল, নতুন এসেছে? তিনি মাথা দোলাতে সে জামার বুক পকেট থেকে হুইসল বের করে বাজিয়ে দিল। বাজাতে আশপাশের বাড়ি থেকে কেউ কেউ জানালা খুলল। একতলা দুতলা তিনতলা বাড়ির কোনও কোনও জানালার পাল্লা খুলে গেল। কে এল? এই রিকশওয়ালাকে কে না চেনে এই শহরে? এই রিয়াজুদ্দিন সারাদিন কাউকে না কাউকে খুঁজে বেড়ায়। তার রিকশ কোনও কোনওদিন সেই প্যাসেঞ্জারই পায় যে শহরে আসে কাউকে না কাউকে খুঁজতে। ঠিকানা নিয়ে আসে তেলচিটে কাগজে। কিছু স্পষ্ট কিছু অস্পষ্ট! কিছু মনে রাখা কিছু ভুলে যাওয়া মানুষের মুখ খুঁজতে সে হুইসল বাজিয়ে বাজিয়ে পল্লির ভিতরে অচেনা কাউকে নিয়ে ঢুকে পড়ে। সুতরাং চায়ের দোকানের মানুষ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। অমল সেনগুপ্ত! অমল সেনগুপ্তর কি এখন বেঁচে থাকার কথা? তখনই তিনি মধ্য যাট। তাঁর এখন যে বয়স। তারপর চল্লিশ বছর গেছে। মানে অমল সেনগুপ্ত এখন ১০০ পার। রিকশওয়ালা চায়ের দোকানে খোঁজ নিয়ে কোনও পাত্তা করতে পারল না। মনে হয় সেই বাড়িই নেই। ভেঙেচুরে বহুতল। আচ্ছা তপোমিতা দত্ত? দত্ত না বসু? জানালা খুলছে যেন এক পুরনো বাড়ির। তার গ্রিল ধরে এক বিস্মিত মুখ। বছর তিরিশ-বত্রিশ। নাকি সত্তর-বাহাত্তর? তপোমিতা! কেউ কেউ আছে এই শহরে কেন সব শহরে, এই হুইসলের শব্দের জন্য কান পেতে। সকাল থেকে বারবার অন্যমনস্ক হয়। হুইসল হুইসল। শ্যামের বাঁশি। ওগো শোনো কে বাজায়। কতদিন পরে ভ্রমর এসেছে পদ্মবনে! সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা।

তিনি ফিরতে ফিরতে ভেবেছিলেন বিজনের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যেতে পারে। হল না। দেবেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, হল না। তাই শহর ত্যাগ করবেন মনে মনে সেই সিদ্ধান্ত নিলেন। রিয়াজুদ্দিন বলল, আর এক-দুদিন টায়েম দেন স্যার, ঠিক খুঁজে বের করব।

কাকে খুঁজে বের করবে?

রিয়াজুদ্দিন হাসে, যারে আপনি খুঁজাখুঁজি করছেন।

বিজনকুমার সিংহ, আমার ফোন নম্বর নাও, পেলেই মিসড কল দেবে, আমি চলে আসব।

আর কেউ না, মল্লিকবাবু?

তপোমিতা দত্ত।

ঠিক আছে স্যার, হবে, আপনার নাম ফোন নম্বর দিয়ে দেব তাঁদের, তাঁরাই ফোন করবে।

তিনি ভেবেছিলেন ত্যাগ করবেন শহর, কিন্তু তা হয় না। আচমকা ফোন এল সাড়ে বারোটা নাগাদ। অচেনা নম্বর। কে? আমি শোভন, কোচবিহার থেকে আসছি শোভন, বড়মামা তুমি কোথায়?

কেন? সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা তাঁর।

এসে দেখছি তোমার ফ্ল্যাট বন্ধ, ট্রেন চার ঘণ্টা লেট, দশটা নাগাদ পৌঁছেছে, খুঁজে খুঁজে এয়েছি, কিন্তু তুমি নেই।

আমি তো কলকাতার বাইরে। নির্লিপ্ত গলায় বললেন অনুপম।

বাহ, তুমি যে বাইরে যাবে বলোনি তো, মা তো বুধবার তোমাকে ফোন করেছিল, আমি ঝামেলায় পড়ে গেলাম।

অনুপম বললেন, তোমার মা ফোন করেনি তো।

আমি এখন কোথায় থাকি?

না বলে এলে কেন? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

তুমি তো বাইরে যাবে বলোনি।

কবে এগজাম? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

সামনে, মানে পরের মাসের প্রথমে। শোভন বলল।

তখন এসো। বললেন অনুপম, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, অনেকবার বলছিল, আমি এখন ফিরব না।

কিন্তু আমি যে এসে পড়েছি বড়মামা, তুমি কবে আসবে বলো, আজ আমি কোথাও থেকে যাব, কাল এসো।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, আমার এই মোবাইল নম্বর দিল কে?

পেয়ে গেলাম, ভবতোষ আঙ্কেল দিল, ভবতোষ কুণ্ডু, তোমার বন্ধু।

শোভন আজ সাড়ে এগারোটা নাগাদ রানি বিধুমুখী রোডে পৌঁছয়। ফ্ল্যাটবাড়ি খুঁজতে গিয়ে ভবতোষ কুণ্ডুর সঙ্গেই চা-

দোকানে দেখা। ভাগ্নে পরিচয় শুনে ভবতোষ তাঁর অনুপস্থিতির খবর দিয়ে তাকে নিয়ে হাউজিং কমপ্লেক্সে যায়। কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞেস করে ডুপ্লিকেট চাবি আছে কি না। থাকার কথা। কিন্তু নেই মানে কেয়ারটেকার চেপে গেছে। তখন ভবতোষ কেয়ারটেকারকে বলে যে কোনও একটি বন্ধ ফ্ল্যাট খুলে অনুপম স্যারের ভাগ্নেকে আশ্রয় দিতে। কিন্তু কেয়ারটেকার বলে বিলেত থেকে পারমিশন না এলে হবে না। শুনে শোভন তাকে মারবেই ঠিক করেছিল। তার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। এমন বেয়াদপি সে সহ্য করবে কেন? তার কথায় না বলার সাহস কারও হয় না। কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে বড়মামার বদনাম হবে বলে। বড়মামা বলে দিলে কেয়ারটেকার হাউজিংয়ের কমিউনিটি হলের গেস্ট রুমে থাকতে দিতে পারে। তারপর বড়মামা ফিরে এলে সে তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকবে। অনুপম বললেন, কোঅপারেটিভের একটা আইন আছে, কমিউনিটি হলে তাঁর গেস্ট রাখতে হলে বিলেত থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। ফ্ল্যাটের মালিক তাঁর কাছে রাখতে পারেন, গেস্ট রুমে অতিথি বিনা পারমিশনে কেউ রাখতে পারেন না। কিন্তু শোভন বলল, হবে মামা, ওকে একশো টাকা ধরিয়ে দিলেই হয়ে যাবে, চাঁদির কাছে সবাই জব্দ, ও তাই চায় মনে হয়। তখন ভবতোষ কুণ্ডু ফোন নিল, স্যার আপনার ভাগ্নে তো বিপদে পড়েছে, কী করব?

অনুপম বললেন, আপনার বাড়িতে কদিন রাখুন, আমি নেক্সট উইকে ফিরব।

সে কী স্যার, আপনার ভাগ্নে আমার বাড়িতে থাকবে কোথায়, জায়গা নেই বলেই আমি রাস্তায় ঘুরি, কেয়ারটেকার গেস্ট রুমে রাখুক স্যার।

অনুপম স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর গলায় বললেন, ওর এগজাম পরের মাসে, না বলে এত তাড়াতাড়ি এল কেন?

ভবতোষ কুণ্ডু বলল, এখানে চাকরির জন্য এসেছে, আপনি ইয়েস করুন স্যার, পার্টির প্রোগ্রাম আছে বলে আগে এসেছে স্যার, আপনার ভাগ্নে ফেলনা কেউ না, পার্টির লোক।

॥ আট ॥

দুদিন তিনি মেদিনীপুর শহরে রয়ে গেলেন। অনুপমকে টলাতে পারেনি দুজনের কেউই। শোভন বিনা টিকিটে এসেছে পার্টির প্রোগ্রামের সঙ্গে। পার্টির কথা তো অমান্য করতে পারে না। তা না হলে দিনকয় বাদেই আসত। অনুপমকে বলেছিল সুমি, শোভন যদি কদিন আগে আসে অসুবিধে হবে তাঁর? অনুপম জবাব দেননি। ফিরবেন ঠিক করেও ফিরলেন না তিনি। দিনে পার্টির প্রোগ্রাম। রাতে আবার ট্রেন বোঝাই হয়ে সব ফিরবে। শোভন ফিরে যাক। পরীক্ষার আগে আসুক। কোচিং কোচবিহারেই নিক। তিনি বললেন নেক্সট উইকে ফিরবেন। অনুপম চেক আউট করলেন না। হোটেলের ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে শহর নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। মানুষজন দেখতে লাগলেন। একটা পুরনো শিমুল গাছ দেখতে লাগলেন। পাখিদের কিচিরমিচির, ওড়াউড়ি দেখতে লাগলেন। রিয়াজুদ্দিনের রিকশ এলে বেরোনর জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

রিয়াজুদ্দিনের রিকশয় অনুপম নিয়ম করে সকালে আর বিকেলে ঘুরতে লাগলেন শহরে। রিয়াজুদ্দিন মাঝে-মধ্যেই হুইসল বাজাতে লাগল। তার হুইসলে অনেক জানালার পাল্লা খুলে গেল কখনও পুরো, কখনও অল্প একটু। চোখ দেখা গেল। মুখের একটুখানি। কে এল কাকে খুঁজতে? আমাকে না অন্য কাউকে? আমাকে খুঁজতে কে এসেছে? সে কে? তাহলে কি...? কতদিন পরে ভ্রমর..., আহা কতজন কতজনের কথা ভাবে মনে মনে। ভোলেনি কতজন কতজনের কথা। দুদিন কোনও ফোন এল না। এল না মানে শোভন হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। কেয়ারটেকার জানে, না বলে আশ্রয় দিয়ে এর আগে ক'জনের চাকরি গেছে। তিনি কলকাতায় ফিরতে লাগলেন।

সন্ধে হয়ে গেল ফিরতে। হাউজিংয়ে ঢোকার মুখে দেখা কেয়ারটেকারের সঙ্গে। সে দক্ষিণ ২৪ পরগনার লোক। দুধকুমার মিদ্যে বেশ লম্বা, স্বাস্থ্যবান। কনস্ট্রাকশনের সময় থেকেই এই হাউজিংয়ে আছে। তখন আরও কয়েকজনের সঙ্গে সেও এসেছিল ঠিকেদারের মজুর হয়ে। রাজমিস্ত্রির কাজ করত। রাতে থাকত অনেকের সঙ্গে। সেই সময় কীভাবে কীভাবে যেন মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। তাদের একজন আবার বারুইপুরের লোক। সায়েন্টিস্ট। ইংল্যান্ডে থাকেন। তাঁর ফ্ল্যাটেই ভাড়া থাকেন অনুপম। বিজ্ঞানীই তাকে বহাল করে গেছে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। দুধকুমার একটু গোঁয়ার। সমুদ্র উপকূলের মানুষ অমনি হয়। তার বাড়ি সাগরদ্বীপে। কত প্রলোভন পেয়েছে বন্ধ ফ্ল্যাট এক-দুই রাতের জন্য ভাড়া দেওয়ার। মোটা টাকা। আর দুই কেয়ারটেকার আছে অন্য দুই ব্লকে । তাদের একজন এই কাজ করত। জানাজানি হওয়ায় তার চাকরি গেছে। এক তালা বন্ধ ফ্ল্যাট। একরাতের জন্য হাজার দুই হতেই পারে। কয়েক ঘণ্টার জন্যও বেশ দামে ভাড়া হতে পারে। সঙ্গিনী নিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটানোর এত ভালো জায়গা পাবে কোথায়? সন্ধ্যায় তিনি ফ্ল্যাটে ঢুকতে দুধকুমার বলল, স্যার আমাকে তো বলে যাননি, আমি কেন থাকতে দেব?

চলে গেছে? সোফায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন অনুপম।

মনে হয়, স্যার আপনি ওই ভবতোষ লোকটাকে বেশি আশকারা দেবেন না, এমন দেখাতে লাগল যেন আপনার নিজের কেউ, ফালতু লোক।

অনুপম মন্তব্য করলেন না। দুধকুমার বলল, ভবতোষ আর ভাগ্নের সঙ্গে তার লেগে গিয়েছিল প্রায়। শুধু স্যারের ভাগ্নে বলে ছেড়ে দিয়েছে সে।

তিনি বললেন, খুব ভালো করেছে সে, বুদ্ধিমানের মতো বলেছে বিলেত থেকে পারমিশন আনতে হবে অন্য কোনও ফ্ল্যাটে থাকতে, সকলেই প্রায় বিলেতে থাকে।

দুধকুমার আরও কিছু কথা বলে তাঁর রাতের রুটি, তরকারি, আর মিষ্টি আনতে টাকা নিয়ে চলে গেল। তিনি জানালা খুলে দিলেন। ব্যালকনিতে বসে ফোন করলেন রান্নার লোক এবং কাজের পরিচারিকা রুকসানা মাসিকে। নিজের ফ্ল্যাট, নিজের জায়গায় ফিরে অনেক নিশ্চিন্ত। শোভন ফিরে গেছে ঠিক। কুন্তলা নেই। টুটুল নেই। বুবুল তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তিনি জীবনের অবধারিত নিয়মমতো একা হয়েছেন। এখন একা থাকতেই নিশ্চিন্ত লাগে।

তিনি ফ্রেশ হয়ে পোশাক বদল করে ঘরে ঢুকে কম্পিউটার অন করলেন । ইউটিউবে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান। গান বয়ে যেতে লাগল ঘরের ভিতর। ইজিচেয়ারে আধ-শোয়া হয়ে তিনি গানের ভিতরে ডুব দিলেন। সুমির গানের গলা ছিল। সন্ধ্যা, লতা, প্রতিমা থেকে অচেনা কণ্ঠের গান গাইত। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সিনেমার গান। কী গান কী ছবি? বাঁশুরী। মনে পড়ে। ভোলেননি কেন? তাহলে কি সুমিকে ভুলতে পারেননি তিনি? সুমিকে তিনি ভালোবেসেছিলেন? মনে হয় না। তবে নেশা ধরিয়েছিল। সেই নেশা কেটে গেল সুমি বর্ধমানে বাবা মা'র কাছে চলে যেতে। শোভনকে ফিরিয়ে দিলেন, সুমির প্রতি দুর্বলতা থাকলে তা হতো? সুমি আর ফোন করেনি। ছেলের কাছে শুনেও না। গুনগুন করে উঠলেন অনুপম, ও বাঁশি বাঁশিরে, যখন তখন নাম ধরিয়া ডাইক্যনা আর... দিন দুপুরে করুণ সুরে...আর বাইজ্য না বাঁশি, আর বাইজ্য না... গাইতে গাইতে সুমির চোখে জল। সাবিনা ইয়াসমিন নামে সাতক্ষীরের এক মেয়ে গেয়েছিল এই গান। সুমি বলত করবীর মতো হিরোইন হবে সে। তার নায়ক হবে রজ্জাক। লাহোর চলে যেতই যদি মা তার সইয়ের কাছে ইন্ডিয়ায় না পাঠিয়ে দিত। বেল বাজল। দুধকুমার ফেরত এসেছে রাতের খাবার নিয়ে। তিনি উঠলেন। দরজা খুলে ভুত দেখলেন যেন। এ কে? দেখলেন অচেনা এক যুবক। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ। পিঠে

রুকস্যাক। হাতে একটি ক্যারি ব্যাগ। সে বলল, মামা ধরো। তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েই ঢিপ করে প্রণাম করল, জানি তুমি আমার জন্য আগে চলে আসবেই, মা তাই বলল, মা বলল তুমি কাজ ফেলেই চলে আসবে।

তুমি কে? অবাক অনুপম জিজ্ঞেস করলেন আন্দাজ করেও।

আমি শোভন, আমার নামও বাবলু, মামা তুমিও আমার মা'র বাবলুদা।

তুমি ফিরে যাওনি?

না মামা, আমি কলেজ স্ট্রিটে একটা মেসে ছিলাম, দুদিন তো, আজ ঘুরতে এসেছিলাম এদিকে, তখন ওই বেটাকে দেখতে পাই, ভবতোষ আঙ্কেলই জেরা করে জানল তুমি ফিরে এসেছ, ব্যাটা বহুত হারামি, তুমি আমার মামা না ওর মামা! বলতে বলতে সে ঢুকে পড়েছে ভিতরে, বলল, দুজনের মতো ফুড এনেছি, মামা তুমি কেমন আছ, হাউ আর ইউ মামা, আই অ্যাম ওয়েল।

বিস্ময় আর কাটে না। সুমিরই ছেলে বটে। সুমির মতো চোখ। বড় বড়। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। রুকস্যাক রেখে সে ফ্ল্যাট দেখছে ঘুরে ঘুরে। বেডরুম। তিনটির একটি অনুপমের নিজের। অন্য একটি ঘর রয়েছে টুটুলের জন্য। টুটুলের বিয়ের খাট, আলমারি, ওয়ার্ডরোব সব সেই ঘরে। অন্য ঘরটি বুবুলের থাকার জন্য সাজানো আছে। বুবুল আসে কই, তেমন থাকে কই? তার ঘরে ডাবল বেড খাট আর দুটি চেয়ার একটি টেবিল। ছোট একটা আলমারি। ঘর দুটি বাইরে থেকে দরজা টানা থাকে। সপ্তাহে একবার রুকসানা মাসি ঝাটপাট দিয়ে সাফসুফ করে দেয়। শোভন ফিরে এল পরিদর্শন করে, বলল, মামা আমি দাদার ঘরে থাকি, একটা কম্পিউটার আছে ওঘরে।

ওটা টুটুলের, পাসওয়ার্ড ছাড়া খুলবে না। অনুপম বললেন।

আমি দাদার কাছ থেকে জেনে নেব, তোমার চিন্তা নেই।

তুমি এই লিভিঙে থাকতে পারো, ওদের ঘর ওদের থাক, আছ তো কয়েকদিন মাত্র।

দাদা আমাকে তার ঘরেই থাকতে বলেছে মামা।

অনুপম বিরক্ত হলেন, বললেন, ওর কম্পিউটারে আমিই হাত দিইনি, আলাদা ল্যাপটপ কিনে নিয়েছি।

মামা তুমি কি আনলিমিটেড নেট ইউজ করো? মুখোমুখি সোফায় গ্যাঁট হয়ে বসে শোভন জিজ্ঞেস করে।

কেন? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

তুমি ওয়াই-ফাই ব্যবহার করো মামা? জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করে শোভন।

কী হবে? বিরক্ত হন অনুপম। এত কথায় তিনি অভ্যস্ত নন।

ওয়াই-ফাই থাকলে আমার এর নেটের খরচ লাগবে না বাড়িতে, আমাদের কোচবিহারের বাড়িতে রেখেছি, ল্যাপটপ, মোবাইল সব এক ইন্টারনেটেই হয়, আমি বুঝিয়ে দেব। বলে পা নাচাতে থাকে শোভন। তারপর বলে, মামা ফ্ল্যাটটা খুব ভালো। নাইস, কিনে নাও।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মাত্র ক'দিন থাকবে, এত কিছুর দরকার কী?

কথা গায়ে না মেখে শোভন জিজ্ঞেস করল, আমি ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা করে দেব, একটা মোডেম কিনতে হবে।

একা মানুষ, এত দরকার কী? অনুপম বললেন শান্ত স্বরে।

শোভন বলল, মামা তুমি একা থাকো কেন, ভয় করে না?

কীসের ভয়?

তোমার তো বয়স হয়েছে মামা।

বয়স হয়েছে তো কী? অনুপম বিরক্ত হলেন না, বরং শোভন কী বলতে চায় তা আন্দাজ করতে চাইলেন। তিনি শুনতে চাইছিলেন। শোভন বলল, বয়স্কদের একা থাকা উচিত না।

কেন উচিত না?

দেখো মামা, আমাদের কোচবিহারে একজন ছিল তোমার মতো, রাতে একা একা টেঁসে গেল, মুখে জলই দেওয়ার কেউ ছিল না।

অনুপম হা হা করে হাসলেন, বললেন, জল কী হবে, আর মানুষ তো একা একাই মরে যায়।

শোভন দমে না, বলে, তোমার রাতে যদি কিছু হয়ে যায়, মানে...

কী হবে? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

শোভন বুঝতে পারছিল না কী বলবে। আবার কী বলবে জেনেও বলবে কী বলবে না তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। সাহসে কুলোচ্ছিল না। সে বলতে চায় রাত-বিরেতে স্ট্রোক হলে কে অনুপমকে নার্সিংহোম কিংবা হাসপাতালে নিয়ে যাবে? ডাক্তার ডাকবে কে? সে জানে এইসব কথায় প্রবীণরা ভয় পান। যত বয়স হয়, মানুষের মৃত্যুভয় হয় তত বেশি। তার বাবা তো শুধু চেকআপ করাত, শরীরের ভিতরের কলকব্জা, হার্ট, রক্ত, রক্তে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ইউরিক অ্যাসিড, সুগার, তারপরেও টিকল না। সে জিজ্ঞেস করল, রেগুলার চেকআপ করাও তো মামা?

কী দরকার তোমার? বিরক্ত হচ্ছিলেন অনুপম। তাঁর অনুমান ভুল হয়ে যাওয়ায় তিনি হতাশ এবং উদ্বিগ্ন। এবং বিরক্তও। কিন্তু শোভন দমে না, বলে, মা বলল খোঁজ নিতে, তাই বলছি, মা বলেছে তোমার সব চেকআপ করিয়ে দিতে, অবিশ্যি চেকআপ করার পরও যে কিছু হবে না তার গ্যারান্টি নেই।

তুমি তোমার চাকরির কথা ভাবো, আর কিছু ভাবতে হবে না, ভালো করে এগজাম দাও যাতে চাকরিটা হয়।

শোভন অবাক হচ্ছিল এত বয়সের এক মানুষের টেঁটিয়া জবাবে। সেও কম নয়, বলল, চাকরি যাতে হয় সেই জন্যই এসেছি, কিন্তু তোমার কথা তো ভাবতে হবে, বলছি, একা লোকের খুব অসুবিধে, তোমার একা থাকা ঠিক না মামা, মা শুনে খুব টেনশন করছে, বলছে বাবলুদা সেই রকম গোঁয়ার, বাবলুদার ব্যাড লাক, এই বয়সে একা কেউ থাকে?

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এগজাম কবে?

সামনেই, কিছু ছেলে-মেয়ে হাইকোর্ট গিয়েছে অ্যাডমিট কার্ড না পেয়ে, হাইকোর্ট এগজাম বন্ধ করে দিয়ে বলেছে সরকারকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে, কোর্ট সব ব্যাপারে নাক গলায় কেন বলো দেখি, কোর্ট থাকলে কোনও কাজই হবে না, পার্টি তো মরে যায়নি!

তাহলে স্থগিত হয়ে গেছে? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

বলতে পারো মামা, কিন্তু তারা যে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিল তা ফেক না অরিজিনাল তা প্রমাণ করতে হবে তো।

প্রমাণ করার তুমি কে, তোমার এগজাম নেই, তাহলে কী করতে এলে? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, এসব সরকার দেখবে।

আমার কাজ এগজামের তারিখ যাতে তাড়াতাড়ি ঘোষণা হয় তা দেখা। শোভন বলল খুব স্পষ্ট গলায়, যুব সম্মিলনীর প্রস্তাব তাই।

তুমি কী সব বলছ আমি বুঝতে পারছি না, কোর্টকে তুমি বলবে?

শোভন হাসে, বলে, আমার কাছে প্রমাণ আছে তারা অ্যাপ্লিকেশন জমা দেয়নি।

বুঝলাম, অনুপম বললেন, তাহলে তুমি এগজামের জন্য

আসোনি?

শোভন খুব বুদ্ধিমান ছেলে। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে তার জুড়ি নেই। বলল, আমি দাদাকে বলেছি যদি আমেরিকায় একটা ব্যবস্থা করা যায়, ঢুকে পড়তে পারলে কেউ আমাকে বের করে দিতে পারবে না, আমেরিকা বলে কথা, হলিউড, লাসভেগাস, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, ম্যাপ যত দেখি অবাক হয়ে যাই, ফেসবুকে আমার অনেক বিলেতের বন্ধু আছে।

তাতে কী হল? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

আমিও আমেরিকায় চলে যাব। হাস্যমুখে বলল শোভন।

হয় নাকি, এখন খুব কড়াকড়ি, গিয়ে কী কাজ করবে?

শোভন বলল, যা হয় করব, ওদেশে সব কিছু করা যায়, দরকারে রেস্টুরেন্টে কাপ প্লেট ধোব, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে হতো, মামা, মা তুমার কত কথা বলে, তুমি খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিলে, একশোয় একশো, মা ছোটবেলায় আমাকে শোনাতো বাবলুমামার মতো হ।

অনুপম বললেন, কোর্টকাছারি হয়ে গেছে, এখন এগজাম নেই, তুমি এসে ভুল করেছ।

না এলে হবে না, যারা কেস করেছে তাদের চাপ দিতে এসেছি যাতে কেস তুলে দেয়। বলে শোভন নিজের মোবাইল খুঁটতে লাগল। তার ভিতরেই তার একটা ফোন এল। ফোন পেয়েই সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ফোন নিয়ে ব্যালকনিতে চলে যায়, হ্যাঁ, নান্টুদা, আমি কলকাতায় রয়ে গেছি, আমার বড়মামার বাড়ি, এখেনে থেকেই সব করব, বলছি তুমি কি আসছ?

...আসছ না, আমি কাল সকালেই বেরব, তুমি একটু বলে দাও, আমি বিনয়স্যারের সঙ্গে দেখা করব।, ধর্নার পিছনে আছোলা বাঁশ ঢুকিয়ে দেব, শোভন রায়কে চেনে না।

...বলে দিয়েছ, সত্যি, কী করে জানলে আমি ফিরিনি কোচবিহার, তুমি তো মালদায়।

... আচ্ছা, তাহলে আমি স্যারের সঙ্গে দেখা করছি, আচ্ছা নান্টুদা, আমি ওদের ধর্না ভেঙে দিয়েই যাব, চমকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বলছে শোভন, তোমার আশীর্বাদ আছে আমার ওপর, আমি পারব নান্টুদা, তুমি কবে ফিরবে জেলায়?

কথা চলতে লাগল। অনুপম অসহ্য বোধ করতে লাগলেন। চোখ বুজলেন।

॥ নয় ॥

এই ফ্ল্যাটে অনেকদিন বাদে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে। এর আগে এমন কথাবার্তা কবে হয়েছিল? টুটুল থাকতে? টুটুল অবশ্য জোরে কথা বলত না। বুবুলও না। তিনিও না। কুন্তলা বলত যখন টুটুল বা বুবুলের ফোন আসত। আমেরিকা থেকে ফোন? দিল্লির ফোন। দূরের ফোন। সুতরাং জোরে না কথা বললে শুনতে পাবে কেন? এই ছেলেটাকে অনুপম পছন্দ করতে পারছেন না। কেন? তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে যেন। কুন্তলা চলে যেতে তিনি একা থাকতে থাকতে, একা থাকার স্বাধীনতা ভোগ করতে করতে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। অ্যাবসলিউট ফ্রিডম কি একেই বলে? তিনি জানেন পূর্ণ স্বাধীনতা হয় না। সমাজের কিছু রীতিনীতি আছে। তা মান্য করতে হয়। পরিবার গড়েছিলেন তিনি একটি। সেই পরিবার ভেঙে গেছে প্রায়। পুত্র কন্যা এবং তিনি, তিন জায়গায় বসবাস। তারা তাদের পরিবার গড়ে তুলছে। সেই পরিবার এই রাষ্ট্রের অংশ। তিনি একা। একা মানুষ সব কিছুতে নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। কিন্তু তা হয় না। দেশ, রাষ্ট্র সমাজ মানুষের অনেক অধিকার হরণ করে নিয়েছে। শোভন অনেক দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছে। তিনি মর্নিংওয়াকে আজ যাননি। তাঁর মনে হচ্ছিল শোভন ঘুমোলেও সে একাই ফ্ল্যাটে থাকবে। শোভনকে একা রেখে তিনি বেরবেন না। রুকসানা মাসি এসে ফেরত যাবে দরজায় তালা দেখে। রুকসানার স্বামীর মোবাইলে তিনি খবর দিয়েছেন গত রাতেই। রান্নার মাসিকেও খবর দিয়েছেন। শোভন উঠল বেলা করে। পৌনে আটটা। রুকসানা মাসি অবাক। কে এসেছে? কে, ও কে দাদাবাবু? শোভন উঠে ব্রাশ করে তার সামনে বসল। বেশ জোরে কথা বলে সে। জিজ্ঞেস করল, মুসলিম?

কেন? তীব্র দৃষ্টিতে তিনি শোভনের চোখে চোখ রাখলেন।

না কিছু না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। শোভন একটু কুঁকড়ে গেছে তাঁর প্রতিক্রিয়ায়। বলল, আসলে আমাদের ওদিকে এমন হয় না, তাই, ঘরে তো ঠাকুর-দেবতা থাকে, এখেনে হিন্দু কাজের লোক পাওয়া যায় না?

রুকসানা মাসি কাজ করে চলে যেতে শোভন বলল, আমার মা অ্যালাও করত না মামা।

তিনি চুপ করে থাকলেন। শোভন কী মনে করে বলল, তার কোনও অসুবিধে হবে না। সে এইসব মানে না, হিন্দু না মুসলিম, জিজ্ঞাসে কোন জন, রবি ঠাকুরের কথা, কবিরা যা বলে সব কি ঠিক বলে!

অসহ্য! উঁচু গলায় শোভন বলছে রবি ঠাকুরের গান ভালো, তুমি রবে নীরবে হিদয়ে মম, আর একটা গান, শাওন রাতে যদি...। যা মনে হয় তাই বলে যাচ্ছে শোভন। সবদিক শুনিয়ে কথা বলে। সে তার কথা চাপিয়ে দিতেই উঁচু গলার আশ্রয় নেয়, মনে হল অনুপমের। তিনি বিব্রত হচ্ছেন শোভনের উচ্চস্বরে। বললেন, তুমি চা করতে পারো?

মা করে দেয়, আর কাজের মেয়েটা, কিন্তু পারি না যে তা নয়।

তাহলে করে নিও। অনুপম বললেন।

তোমার চা কে করে দেয়?

নিজে করে নিই। অনুপম বললেন।

ভালো করো, মুসলিমের হাতের চা না খাওয়া ভালো, আর চা করা কিছু না, আমি না হয় করেই নেব, তোমাকেও করে দেব।

অনুপম বললেন, তুমি এসব আর একবারও বলবে না, আমি পছন্দ করি না। তখন শোভন বলল, তোমার রান্নার লোক কেমন রাঁধে?

অনুপম জবাব দিলেন না। এত কথা বলে কেন এই যুবক? একা থাকার ভিতরে যে সুখ আছে, যে মগ্নতার স্বাদ আছে, তা ব্যাহত হচ্ছে যেন। তিনি চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। দেখতে লাগলেন নিজের বাসস্থান এই ফ্ল্যাটের সিলিং, ঘূর্ণমান পাখা। সিলিঙে ঝুল। সপ্তাহে একবার করে রুকসানা মাসি ঝুল পরিষ্কার করে। এই ঝুল গতরাতেও ছিল না মনে হয়। রুকসানাকে বলতে হবে।

শোভন বলল, আমাকে বেরতে হবে মামা, সুইনহো স্ট্রিট যাব, স্নান করে নিই মামা, মাকে একটা ফোন করতে হবে, মা টেনশনে আছে, তুমি রেস্ট নাও, পরে মা-র সঙ্গে কথা বলো, মা-র ফোনে আন-লিমিটেড কল, তুমি মিসড কল মেরো একবার।

জবাব না পেয়ে শোভন বলল, আমি বাইরে খেয়ে নেব, তোমার চিন্তা করতে হবে না।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, চেনো সুইনহো স্ট্রিট?

কলকাতার সব চিনি মামা, আমি তো আসি প্রায়ই, মামা তুমি ফেসবুক করো?

কেন? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

মায়ের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছি আমি, মা করে, তুমি খুলবে, আমি খুলে দেব?

কী হবে?

মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে, চ্যাট করবে ইন-বক্সে, তোমার হোয়াট'স অ্যাপ আছে?

তিনি বললেন, দরকার নেই।

দরকার আছে মামা, মায়ের হোয়াট'স অ্যাপ আছে, তুমি ছবি পাঠাতে পারবে, ভয়েজ মেসেজ, ভিডিও কল, আমেরিকাতেও ভিডিও কল করতে পারবে, মা-র সঙ্গে ভিডিও কল হবে, মা তোমাকে দেখতে চায়।

তিনি বললেন, তোমার দেরি হয়ে যাবে, সুইনহো স্ট্রিটে কী?

শোভন বলল, একজনের সঙ্গে দেখা করব, কেসের ব্যাপারেই যাচ্ছি, হেবি পাওয়ারফুল ম্যান, বর্ধমানে আমার মামার বাড়ির গ্রামে বাড়ি, তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছে, একটা খবর মাকে দিতে হবে, মা খুব টেনশনে থাকে, তুমি হোয়াট'স অ্যাপে মায়ের সঙ্গে কথা বললে মা খুব খুশি হবে, মা বলে বাবলুদার মতো আর কেউ হয় না, রজ্জাকের মতো দেখতে, রজ্জাকের সঙ্গে নাকি সিনেমা করার কথা হয়েছিল মা'র।

অনুপম বললেন, বেশি বকো না, তুমি স্নানে যাও।

অনুপম একটু বাদে শাওয়ার থেকে জল পড়ার আওয়াজ শুনলেন। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আচমকা গেয়ে ওঠা শোভনের গান। উচ্চৈঃস্বরে গান গেয়ে গেয়ে সে স্নান করছে। গানটি হিন্দি না বাংলা বুঝতে পারছেন না। কিন্তু বেশ কাঁপিয়ে দিচ্ছে ফ্ল্যাট। এই ফ্ল্যাটে এমন হয়নি কখনও। বুবুল টুটুল করত না। তিনি পছন্দ করেন না, তা ওরা জানত। শোভনের স্নান শেষ হল যে তা গান থামতে বুঝলেন তিনি। বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ হল। শোভন উল্লাস প্রকাশ করল, দারুণ হয়েছে বাথরুমটা, হেবি, কাল বাথ টাবে শুয়ে চান করবে সে, আজ দেরি হয়ে যাবে... বলতে বলতে সে ঢুকে গেছে টুটুলের ঘরে। গুনগুন করছে। অনুপম ভাবলেন ওকে বলতে হবে চলে যেতে। পরীক্ষা দিতে আসেনি ও। এসেছে কোর্ট কেস তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে। তাহলে নাকি ওর চাকরি বাঁধা। জেলার পার্টি কর্মকর্তারা বলেছে যদি পারে, তাহলে একজন চাকরি পেলেও ও পাবে। শুনে অদ্ভুত লাগছিল অনুপমের। ও বলছে চাকরি তার বাঁধা। বিনয়দা স্যারের সঙ্গে দেখা করবে দু-একদিনের ভিতর। বিনয়দা স্যার হলেন বিনয় পালোধী। তিনি ক্ষমতাসীন দলের রাজ্য নেতা। অনুপম বললেন, তুমি তো এসব কথা আগে বলোনি।

কালো জিনস আর নীল রঙের টি শার্ট পরে সামনে বসে আছে শোভন, বলল, মামা, এখন এই ভাবে চাকরি হয়, আমি তো পার্টির লোকই, দেখবে কীভাবে কেস তুলি।

কীভাবে তুলবে? অনুপম কৌতূহলী হলেন।

স্রেফ ভয় দেখাব, তাতেই হয়ে যাবে। বলল শোভন মোবাইল খুঁটতে খুঁটতে, কেস না তুললে ডিস্ট্রিক্টে ফিরলেই ক্যালানি, হাত-পা ভেঙে রেখে দেব, ওইটা বলতে এসেছি, কেস উ'ড্র করলেই সব মিটে যাবে। কথাগুলো বলতে বলতে শোভন ফুলে উঠতে থাকে। তার দুই চোখ যেন আগুন হয়ে ওঠে, বলে, মারেই ঠান্ডা হয়ে যাবে।

এটা তো ঠিক না। অনুপম বললেন, ভয় দেখিয়ে জোর করে কেস উইথড্র করাবে?

মামা, ওরা ফালতু কেস করে সবার চাকরি আটকে দিয়েছে, ছাড়ব কেন?

অনুপম চুপ করে থাকলেন। বুঝলেন শোভন খুব সাধারণ নয়। খবরটির কিছু কিছু তিনি জানেন। চরম অনিয়ম হয়েছে অ্যাডমিট কার্ড বিলিতে। যারা টাকা জমা দিয়েছে অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে তারা কেন পরীক্ষায় বসতে পারবে না? পরীক্ষায় না বসতে পারা মানে চাকরি না পাওয়া। পরীক্ষা দিলেই যে চাকরি পাবে তার কোনও গ্যারান্টিও নেই। তবু। শোভন যেন তাঁর মনের কথা ধরতে পারে, বলল, এরপর আবার কেস হবে মামা, পরীক্ষায় বসেছে কিন্তু কেন ইন্টারভিউ পায়নি, তারপর আবার কেস হবে, ইন্টারভিউ পেয়েছে তো চাকরি কেন পায়নি, কোর্টে যাওয়া বন্ধ করতেই আমি এসেছি, ভালো করে ক্যালানি দিলেই ঠান্ডা হয়ে যাবে সব।

আসার আগে তো একথা বলনি। অনুপম ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, বলেছিলে এগজাম আছে।

না বলিনি, বললে তুমি না করতে, মা বলেছিল বলতে, আমিই বললাম, না বলার কথা, বললে তুমি ভয় পেতে, অ্যালাউ করতে না।

অনুপম বললেন, তুমি যা করতে এসেছ, তা আমি সমর্থন করি না, ওরা যদি কোর্টে অভিযোগ করে তোমার অসুবিধে হবে।

শোভন বলল, কিস্যু হবে না, তোমার চিন্তা নেই মামা, আমি আড়ালে থাকব, পুলিসে সব ব্যবস্থা করা আছে।

মাথা নাড়লেন অনুপম, বললেন, আমার এখানে থেকে এসব করতে দিতে পারি না।

হে হে করে হাসল শোভন, বলল, আরে তুমি তো দেখছি দারুণ ভিতু, এটা নর্থ বেঙ্গলের কেস, তোমার কী, আর ওদের সাহসই হবে না ফারদার কমপ্লেন করতে, এমন রেপ কেসে ফাঁসিয়ে দেব, কেঁদে কুল পাবে না, আর মেয়েগুলোকে চমকালেই ঠান্ডা হয়ে যাবে, রেপের ভয় নেই!

অনুপম বললেন, না, আমার এখানে থেকে এই কাজ করবে না, আমি এসব করতে দিতে পারি না।

উফ, তুমি এত ভিতু, মা ঠিকই বলে বাবলুদা খুব ভিতু ছিল, একটুও সাহস ছিল না, অথচ তুমি বিলিয়ান্ট ছিলে, মাকে ইংরিজি শিখিয়েছিলে ছমাসেই যা তারপরে মা আর কিছু শেখেনি। বলে শোভন কানে হিয়ারিং কর্ড দেয়। বেশ বড়সড় মোবাইলে মিউজিক সার্ফ করতে থাকে। কী গান শুনছে ও? সুমি কি বলেছে তার ছেলেকে নিজের কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেওয়ার দিনগুলির কথা। ভিতু। হ্যাঁ, ভিতুই ছিল বাবলু। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা মায়ের সইয়ের মেয়ের ছিল মাত্রাতিরিক্ত সাহস। আগুন ছিল মেয়েটা। রজ্জাক রজ্জাক, তাঁকে সব দিতে পারে সদ্য যুবতী। বাবলুদা তার রজ্জাক। উফ, আর কিছুদিন তাদের বাড়ি থাকলে জ্বালিয়ে দিত ঘর-বাড়ি। বাবলুকে কতবার সে আমবাগানে ডেকেছে। সেই মস্ত এক পুরনো আমবাগান। তাদের নয়। যাদের তারা ছিল এক পড়তি বনেদি বংশ। সুমি এই এত বয়সেও ভোলেনি সেই দিন। বাবলুদা, তুমি একটু সাহসী হও, যা চাও সব দেব আমি, আই লাভ ইউ বাবলুদা, তুমি আমার রজ্জাক, আমি তোমার করবী, তুমি আমার রজ্জাক, রজ্জাক, ও বাঁশি বাঁশিরে, নাম ধইর‍্যা যখন তখন আর ডাইক্য না, দিন দুপুরে করুণ সুরে আর বাইজ্য না, বাঁশি আর বাইজ্য না...।

তুই ঢাকায় গেলেই পারতিস, এলি কেন এপারে? সরে গিয়েছিলেন অনুপম।

পারতাম, সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল, লাস্ট মোমেন্টে মা ধরে ফেলল, বইয়ের ভিতর চিঠি ছিল, না হলে আমি তো ঢাকা থেকে করাচিই চলেই যেতাম, উর্দু সিনেমায় হিরোইন হয়ে যেতাম। বলেছিল সুমি।

শান্ত হ সুমি। অনুপম তাকে থামাতে চেয়েছেন।

মা-বাবা আমার জীবনটাকেই ধ্বংস করে দিল ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে, বাবলুদা প্লিজ, তুমি আমার পাশে থাকো।

শোভন বলল, প্লিজ মামা তুমি রাগ করো না।

তাঁর চটকা ফিরল, বললেন, রাগ করব না কেন, তুমি তো সত্যি কথা বলোনি।

এসব কি ফোনে বলা যায় মামা, তুমি তোমার মতো থাকো, আমি আমার কাজ করি, কোনও অসুবিধে হবে না তোমার, আমি তোমার বাজার করে দেব, কিছুই করতে হবে না তোমাকে, পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকবে, নেট করবে, হোয়াটস আপে কথা বলবে।

অনুপমের কাছে ফোন এল মেয়ের। বুবুল বলল, তুমি কী করছ বাবা?

কী করব? ফোন নিয়ে তিনি ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন মুখোমুখি রাস্তার ওপারের পুরনো বাড়ির ব্যালকনিতে সেই বৃদ্ধা বসে। দুপুরেই শুধু থাকেন না, সকালে এবং বিকেল থেকে। অন্ধ, কিন্তু ব্যালকনিতে আসা চাই-ই। হয়তো অন্ধ নন, ভাসা ভাসা দেখতে পান। মেয়ে বলল, তুমি জবাব দিচ্ছ না কেন বাবা?

বল, কী বলবি বল। অনুপম শান্ত গলায় বললেন।

কী করছ এখন? একই কথা আবার। কথা একটাই। বাবা কী

করছে একা একা?

অনুপম বললেন, কী করব, কিছু না।

তাহলে তো ফোন করতে পারতে বাবা। বুবুল বলল, চুপচাপ বসে না থেকে ফোন করে দুটো কথা তো বলতে পারো।

অনুপম চুপ করে থাকলেন। তখন বুবুল জিজ্ঞেস করল, মেদিনীপুর থেকে কবে ফিরলে?

গতকাল সন্ধেয়।

তোমার বন্ধু বিজনকুমার সিংহর সঙ্গে দেখা হল?

হ্যাঁ। খুবই সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন অনুপম।

দাদা বলল অমন কারও নাম শোনেনি। বুবুল জেরা করছে যেন।

তিনি জবাব দিলেন না।

বাবা তুমি সিউড়ি না এসে মেদিনীপুর গেলে, আমার খুব খারাপ লেগেছে।

তিনি বললেন, দরকার ছিল।

কীসের দরকার বাবা, ইউ আর নিয়ার সেভেন্টি, তোমার আবার কাজ কী, সব কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন তুমি কী কাজে গেলে মেদিনীপুর, দাদা বলল, তোমার এইটা স্বার্থপরতা, তুমি একা থাকতে ভালোবাসো, মাকে দাঁড়ের মাঠে রেখেও জেলায় বদলি নিয়ে একা থেকেছ, আমাদের কলকাতায় রেখে তুমি বাঁকুড়া গেলে দু'বছরের জন্য।

তুই কি সকালে ঝগড়া করছিস আমার সঙ্গে?

তা কেন, তুমি সিউড়ি এলে না অথচ...। কথা অসমাপ্ত রাখে বুবুল।

কেন আমার কি বন্ধুর কাছে যাওয়ার অধিকার নেই?

বিজনকুমার সিংহ নামের কেউ শালবনি থাকে না।

অনুপম বললেন, তুই জানিস?

জানি বাবা, শালবনিতে আমার চারজন ফেসবুক ফ্রেন্ড, অনিমেষ, লিপিকা, সায়ন্তিকা, অনুপ, তারা বলল, এমন কারও কথা জানে না।

তারা সকলকে চেনে? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

চেনে বাবা। টুটুল বলল, ছোট একটা গঞ্জ, সকলে সকলকে চেনে, তুমি কেমন হয়ে যাচ্ছ বাবা।

তিনি আচমকা বললেন, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

কেন, দেখা হয়নি কেন?

অনুপম বললেন, জানি না।

বাবা, তুমি বদলে যাচ্ছ, আমার মনে হয় তোমার একবার দাদার কাছে যাওয়া দরকার, ছ'মাস থেকে এসো।

কেন, ছ'মাস আমি ওখানে কী করব?

বুবুল বলল, দাদার সঙ্গে থাকবে, বাবা, আমাদের একটা ফ্যামিলি আছে, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর তুমি সরে যাচ্ছ ফ্যামিলি থেকে, তুমি কি নিজে বুঝতে পারছ না, নাতিকে দেখতে যাও আমেরিকা।

অনুপম চুপ করে থাকলেন। ছমাস ইউএসএ। ছমাস নির্বাসন। সমস্ত দিন ফ্ল্যাটে একা। সপ্তাহ না ফুরোলে ছেলে কোথাও নিয়ে যাবে না। কেন যাবেন তিনি? ছেলে নিয়ে যেতে চায়। তিনি না করেছেন। তাঁর আমেরিকা নিয়ে অত আহ্লাদ নেই। পশ্চিমের ধনগর্বী দেশ হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার মতো সব দেশের মেধাবীদের বাঁশির সুরে মোহিত করেছে।

॥ দশ ॥

সন্ধে সাতটা নাগাদ শোভন ফিরল। সঙ্গে ভবতোষ। ভবতোষের মুখে হাসি। দেখা করতে এসেছে, বলল, স্যার খুব ঘুরলেন?

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় দেখা হল?

এই তো স্যার, আপনি বেরননি বিকেলে? ভবতোষ জিজ্ঞেস

করল।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, শোভন তোমার কাজ হল?

হয়েছে মামা, তবে আসল কাজ তো বাকি।

মানে ভয় দেখানো?

না, ধর্না ভেঙে দেওয়া, কোর্ট কেস তুলে নেওয়া।

ভবতোষ বলল, খুব এফিসিয়েন্ট আপনার ভাগ্নে, পারবে, আমিও গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে।

ও বলেনি তো আপনি যাচ্ছেন।

উনি তেমন চেনেন না, আমি বললাম যাব, আমার বোন ক'দিন ছুটি নিয়েছে, সারাদিন ঘরে বসে টিভি দেখে, আমি কোথায় যাব সারাদিন?

শোভন বলল, উনি কলকাতার সব রাস্তা চেনেন, এমনকী ফনী মিস্ত্রি লেন পর্যন্ত।

কোথায় তা?

আজ্ঞে নারকেলডাঙা, আমার এক কলিগ থাকে। ভবতোষ বলল।

শোভন বলল, সুইনহো স্ট্রিট ওঁর কাছে জলভাত।

ভবতোষ বলল, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না স্যার, ভাগ্নে হারাবে না, ভাগ্নে দারুণ ছেলে, হেবি কানেকশন, উন্নতি করবে অনেক।

শোভন বলল, কী যে বলো তুমি ভবদা, হারাবো কেন, মোবাইল ইন্টারনেটের যুগে কেউ হারায়?

হারাবে না কিন্তু হয়রান তো হবে। ভবতোষ বলল।

অনুপম অবাক হচ্ছিলেন ভবতোষ এবং শোভনের কথাবার্তায়। ওদের ভিতরে রীতিমতো বন্ধুতা। ভবতোষের সঙ্গে যাবে তা বলেনি কেন শোভন? তারপর ভাবলেন, বলেনি তো কী হয়েছে, এখন চলে গেলে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

শোভন বলল, মেটিয়াবুরুজে যাব, ওখেনে অবশ্য আমি কিছু চিনি না, মানে হারিয়ে যেতে পারি।

পারো, সব পুরনো বাড়ি, গায়ে গা লাগানো, মোবাইলে টাওয়ার থাকে না, নেটও থাকে না। ভবতোষ বলল, পোর্ট এরিয়া তো।

কে বলেছে? জিজ্ঞেস করলেন অনুপম।

ভবতোষ বলল, আমার এক কলিগ থাকে ওখানে, বাড়ির ছাদে এসে ফোন করতে হয় ওকে।

শোভন হেসে বলল, ভবতোষদার কলিগ সারা কলকাতায় ছড়িয়ে, ওই জন্য ভবতোষদা কলকাতার সব চেনে।

ভবতোষ বলল, কর্পোরেশনে কাজ করতাম তো, আমাদের বদলি হতো ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, এক নম্বর থেকে ১২০ নম্বর সব ওয়ার্ডে ঘুরেছি আমি, সবই চিনতাম।

মেটিয়াবুরুজে যেতে হবে আনোয়ার আলি নামের একজনের কাছে। বলল শোভন।

কত নম্বর ওয়ার্ড? ভবতোষ জিজ্ঞেস করল।

তা তো জানি না।

হে হে, ওয়ার্ড নাম্বার জানবে কী করে, অ্যাড্রেস আছে তো?

আছে, কিন্তু তোমাকে যেতে হবে ভবতোষদা।, আমি তো কোনওদিন খিদিরপুরই যাইনি, মেটিয়াবুরুজ তো আরও ভিতরে।

ভবতোষ বলল, আমি আছি, স্যারের ভাগ্নে তুমি, তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।

অনুপম উঠে গেলেন। এত কথায় বিরক্ত লাগছে। অন্ধকার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভিতরে ভবতোষ এবং শোভন কথা বলতে লাগল। হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। জোরে জোরে। অনুপম যে ওদের থামতে বলবেন, পারলেন না। কিন্তু এইটা তো সত্য, এই নিঝুম ফ্ল্যাট এত কথা শোনেননি অনেক দিন। তিনি দেখলেন অন্ধকারে রাস্তার ওপারের ব্যালকনিতে বৃদ্ধা বসে আছেন চেয়ারে। ওই ব্যালকনিতে আলো জ্বলছে। বৃদ্ধা এদিকে তাকিয়ে। কী দেখেন অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চোখে? ভবতোষ এবং শোভন টুটুলের ঘরে ঢুকে গেছে। সেখানে তুমুল কথাবার্তা চলছে। শোনা যাচ্ছে ব্যালকনিতে বসেও। ভবতোষ এমনই চেয়েছিল। নিজের বাড়িতে জায়গা নেই, এখানে প্রবেশ করতে চায়। শোভনকে ধরে ঢুকে পড়েছে। অনুমতির প্রয়োজন হয়নি। তিনি ব্যালকনির চেয়ারে বসে রাস্তার ওপারের ব্যালকনিতে চেয়ে থাকলেন। ওই বৃদ্ধা যদি অন্ধ হন, উনি দেখবেন অন্ধকারই। অনুপম দেখলেন আলোর ভিতরে প্রায় অন্ধকার এক স্তূপ। অন্ধ চোখই আলোর ভিতরে ব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে। তিনি অন্ধকারে, ওপারের উনিও।

শোভন এল ব্যালকনিতে, বেরচ্ছি মামা, রুটি নিয়ে ফিরব।

দিয়ে যাবে, আমি টাকা দিয়ে এসেছি।

আচ্ছা, ও কি সব দিন দিয়ে যাবে?

বললে দিয়ে যায়।

শোভন বলল, আমি গরম রুটি নিয়ে আসব, তোমার চিন্তা নেই।

তুমি ক'দিনের জন্য এসেছ, তোমাকে এসব করতে হবে না, সব দিন আমিই নিয়ে আসি, আজ বলে এসেছি। অনুপমের গলার স্বর একটু কঠিন।

শোভন চুপ করে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর চলে যায়। ভবতোষকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। অনুপম কেমন নিশ্চিন্ত বোধ করেন। ওরা দরজা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে গেছে। এখন ভিতর থেকে না খুললে খুলবে না। আর যদি চাবি নিয়ে যায় খুলবে। তিনি দেখলেন চাবি নিয়ে যায়নি। চাবি রয়েছে দেওয়ালের রিঙেই। তিনি এখন বেরিয়ে পড়তে পারেন দরজায় চাবি দিয়ে। অথবা ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। শোভন ডোর বেল দিয়েও সাড়া পাবে না। সুমির ছেলেটিকে তাঁর ভালো লাগছে না একদম। ভবতোষকেও না। আসলে তিনি একা থাকতে চান। সমস্ত জীবন কোলাহলে কাটিয়েছেন। পরিবার, অফিস, গ্রাম-গঞ্জের মানুষ নিয়ে কেটেছে জীবন। এখন সমস্ত কিছু থেকে বিমুক্ত হয়ে নিজের একটা স্বাধীন সত্তা নিয়ে কাটাতে চান। ভুল না ঠিক জানেন না। কিন্তু এই জীবনে যে সুখ আছে তা তিনি টের পাচ্ছেন। পুরাকালে পরিবার পরিজন ফেলে রেখে মানুষ বাণপ্রস্থে যেত। স্ত্রী থাকলে তিনি সহগামিনী হতেন। না থাকলে একা। একা হয়ে যেতেই অরণ্যবাসী হওয়া। অরণ্যবাসী হওয়ার ভিতরে আলাদা আনন্দ নিশ্চয় ছিল। তিনি একা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে চাইছেন সকলের থেকে। জনারণ্য থেকে আলাদা।

ফোন এল তাঁর মোবাইলে। বলছি, কে?

সুমি গো বাবলুদা, তোমার সুমি।

তিনি বললেন, কেন?

কেন আবার, কথা কি বলা যায় না রজ্জাক।

কদিন আগে মারা গেছে।

হুঁ, ফেসবুকে দেখেছি, এত কষ্ট হল বাবলুদা, আমার ফেবারিট হিরো।, সেই তখন রজ্জাককে আমি সব দিতে পারতাম।

উফ! থাম সুমি। বলতে গিয়ে অনুপম চুপ করে থাকলেন। কথায় কথা বাড়ে। তিনি বলতেন হয়তো, কিন্তু শোভন যখন শুনবে, উৎসাহিত হয়ে উঠবে। মায়ের সঙ্গে ওর নিশ্চয় কথা হয়। একটু আগেও হয়েছে। ও বলেছে মামা একা রয়েছে ফ্ল্যাটে, তুমি ফোন করো মা। শোভন আন্দাজ করে মায়ের এই সম্পর্কের কথা?

হ্যাঁ গো বাবলুদা তুমি ফেসবুকে নেই কেন? সুমি জিজ্ঞেস করল।

ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড, সেখানে আরও বেশি মানুষ।

সেই জন্যই তো ফেসবুকে আসা, ফেসবুক না থাকলে তোমাকে খুঁজে পেতাম? একা বসে কী করো?

কিছু না। অনুপম সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

কিছু না আবার কী কথা, এখন কী করছ?

কিছু না। বিরক্ত হতে গিয়েও হলেন না। সুমির কণ্ঠস্বর ছিল মিঠে। বাতাসের মতো নির্ভার যেন। গীতা দত্তর গলার মাদকতা ছিল। মুগ্ধ হওয়ার মতো। মনে আছে। এখনও তেমন আছে। থাকুক। তিনি বললেন, এখন আমি গান শুনব সুমি।

কী গান শুনবে, বাঁশুরী সিনেমার সেই গান, ও বাঁশি, বাঁশিরে দিনদুপুরে অমন কইর‍্যা আর ডাইক্যা না।

তাঁর মনে পড়ে গেল, রজ্জাক, করবী, তিনি সেই প্রথম একজনের মুখে রজ্জাকের নাম শুনলেন। সীমান্তের ওপারে যে দেশ সেখানে সব আলাদা। সিনেমা থেকে গানও। অদ্ভুত লাগত! মেয়ে ওপারের সিনেমার গান মুখে নিয়ে ঘোরে।

সুমি বলল, চুপ করে থাকো বাবলুদা, আমি তোমাকে শোনাই গান।

মোবাইলে গান শোনা যায় না।

তুমি হোয়াটস আপ খোলো, আমি তোমাকে ভয়েস ক্লিপ পাঠিয়ে দেব, গান, ফিসফিস।

অনুপম বলল, সুমি আমি এখন রাখছি।

না রাখবে না, একা অতবড় একটা ফ্ল্যাটে বসে কী করো, কথা বললে কী হয়? সুমি মুখঝামটা দেয়।

আমি রাখছি, পরে কথা বলব।

পরে কখন, রাতে?

চুপ করে থাকলেন অনুপম। সুমির বয়স হয়নি? রাতে ফোন করবে কেন। চারদিক সব বদলে গেছে। কবে কখন বদলাল তিনি ধরতে পারেননি। নাহলে সুমির কোনও সম্ভাবনাই ছিল না তাঁকে খুঁজে বের করা। সুমি ডাকল, হ্যালো বাবলুদা, তুমি কি বিরক্ত হচ্ছো?

কী মনে হল, তিনি বললেন, তোমার ছেলে তো এগজাম দিতে আসেনি।

তাই, দরকারেই তো গেছে কলকাতা।

আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল। অনুপম বললেন।

না, গিয়ে সব বলবে বলেছিল বাবলুদা, বুঝিয়ে না বললে তুমি বুঝবে না।

সে যে কারণে এসেছে, তা ঠিক না।

আচ্ছা, আমি তো সব জানি না, কিন্তু ও তোমাকে বিব্রত করবে না, তোমার ছেলে টুটুল, সূর্যনীলই তো বলল তোমার কাছে যেতে।

সে কি জানে ও কেন এসেছে?

সুমি আচমকা ফুঁসে উঠল, আমার কি কোনও অধিকার নেই বাবলুদা, মনে আছে কি, আমি কী বলেছিলাম চলে আসার সময়?

মনে পড়ে। কিশোরীর চোখে জল। চলে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি সুখী হব না বাবলুদা। তারপর সে হারিয়ে গেল।

সুমি বলল, আমার ছেলে তোমার ফাঁকা ফ্ল্যাটের এক কোণে থাকবে ক'দিন, আমাদের তো কোনও শেল্টার নেই কলকাতায়।

অনুপম বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোর কথা সুমি।

সুমি উল্লসিত হয়ে উঠল, ঠিক যেন সেই অনেকদিন আগের বাবলুদা, তুই করে বলতে আমাকে, মনে হয় কত জন্মের আগের কথা, আমি যেন সেই দিনে ফিরে গেছি বাবলুদা।

অনুপম বললেন, আমি রাখছি, তোর ছেলেকে এসব না করে পড়াশোনা করতে বল, কিছুই জানে না, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রজনীকান্ত আলাদা করতে পারে না, অজ্ঞান যুবক।

এমন বলো তুমি বাবলুদা, আচ্ছা পড়ে কী করবে, এমএ পাশ ছেলে এখন ঝাড়ুদারের চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করছে, চাকরি এখন দাদাদের হাতে, কত টাকায় বিক্রি হচ্ছে জানো তো, ছেলেগুলো কী করবে বলো দেখি, রবি ঠাকুর, নজরুল কি চাকরি দেবে?

তিনি বললেন, ওকে ফিরে যেতে বলিস, যদি কোনও খারাপ ব্যাপারে জড়িয়ে যায়, বেরতে পারবে না, আমি সাহায্য করতে পারব না।

এমন কথা তুমি বললে বাবলুদা, তা হবে কেন, ওকে সকলে খুব ভালোবাসে, ওর কিছু হবে না, ও খুব বুদ্ধিমান ছেলে।

তখন উদ্বিগ্ন অনুপম বললেন, ও যা করতে এসেছে, তা খুব রিস্কি।

যদি তোমার মনে হয় ও খারাপ কাজ করতে গেছে, ফ্ল্যাটে ঢুকতে দিও না আর, বাবলুদা, তুমি সব ভুলে গেছ, মেয়েদের জীবনের কোনও দাম নেই পুরুষমানুষের কাছে, আমি কী করে বেঁচে আছি তা যদি জানতে।

অনুপম বিব্রত হয়ে চুপ। সুমি সেই তার দাঁড়ের মাঠের দিনগুলির কথা বলতে লাগল। সাতক্ষীরে থেকে প্রথমে পার করে দিয়েছিল ওর বাবা মেয়েকে, ইন্ডিয়া নিয়ে এসেছিল। সকলে চলে আসবে, কিন্তু তার জন্য ভূসম্পত্তি বেচতে হবে। বিনিময়ের পরিবার খুঁজছে। বর্ধমানে যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু সব হতে ছ-মাস লাগবে। এর ভিতরে মেয়ে যদি কিছু করে বসে। ক'দিন মেয়েটা চুপ করে বসে ছিল। বলা যায় না, সিনেমার টানে করাচি চলে গেলে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। সুমি বলতে থাকে কেমন ছিল সেই দিনগুলি। বাবলুদা, তুমিই আমার দুঃখের সাথী হয়েছিলে। আমার তো মনে হচ্ছিল পালিয়ে যাই, মনের ভিতরে কান্না চেপে বসে থাকতাম...। এতদিন পর তুমিও একা, আমিও একা বাবলুদা। কথাগুলো শোনো।

॥ এগারো ॥

অনুপম ফোন কেটে দিলেন। তারপর তার সাউন্ড মিউট করে দিলেন। সাইলেন্ট মোডে থাকার সুবিধে কোনও ফোন এলে বোঝা যায় না। ধরতে হয় না। পরে দেখা যাবে কারা ফোন করেছিল। ওর কথা শেষ হয়নি। মনে পড়ে যাচ্ছে সব। এই বয়সে পুরাতন প্রেম ফিরে আসে! মেয়েটা ভুলতে পারছিল না আশাভঙ্গের বেদনা। চুপ করে বসে থাকত। তখন সেই বাড়ির নবীন যুবকটি এগিয়েছিল তার দিকে। শান্ত করতে পেরেছিল। হাত ধরেছিল তার, বলেছিল, তোর পাকিস্তানের হিরোর চেয়ে উত্তমকুমার অনেক উত্তম।

মেয়েটি ঘাড় বাঁকিয়ে তাকে দেখেছিল, চোখে ফুটে উঠেছিল রাগ, বলেছিল, তোমাকে কে ওকালতি করতে বলেছে?

যুবক অনুপম বলেছিল, সিনেমা দেখবি, দেখেছিস উত্তম-সুচিত্রা?

তুমি রজ্জাক-করবীর বই দেখেছ?

অনুপম বলেছিল, উত্তম-সুচিত্রার ওপরে কেউ হবে না।

মেয়ে যেন জেগে উঠেছিল,আমি কোনওদিন দেখিনি উত্তম-সুচিত্রা, সাতক্ষীরের হলে একবার দেখিয়েছিল শুনেছি, আমি দেখতে পাইনি, দেখাবে?

কদিনের ভিতরে সুযোগ এল। বসিরহাট মিলনী সিনেমায় মা যাবে উত্তম-সুচিত্রার 'সবার উপরে' দেখতে। মায়ের সঙ্গে সুমি যাবে ধরল। মা বলল, বাবলু তুইও চ। বাবলু মানে অনুপম। মেয়েটা মন খারাপ করে বসে থাকে, সিনেমা দেখলে যদি মা-বাবার কথা ভুলে থাকে। তারা কবে আসবে এদেশে পাকাপাকিভাবে, তার কি ঠিক আছে? মেয়ে পার করে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত। দরকারে পরের বছর ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে। মা জানতই না মেয়েকে নিয়ে কেমন বিপদে পড়েছিল তার মা বাবা।

মেয়ের সাধ ছিল, পালিয়ে ঢাকা হয়ে করাচি চলে যেত উর্দু সিনেমার হিরোইন হতে। ঢাকায় গিয়ে রজ্জাকের হিরোইন হতো। সুমি সব বলেছিল অনুপমকে। কিন্তু সে তো ঘনিষ্ঠতার পরে। সুমি অনুপম গেল মায়ের সঙ্গে। কিন্তু সিনেমা দেখবে কী, মেয়ে তার হাত ধরে থাকল সমস্ত সময়। মা কিছু বোঝেনি। মায়ের তেমন নজরও ছিল না, মুগ্ধ হয়ে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান শুনছিল। সুচিত্রা-উত্তমকে দেখে বিমোহিত হয়েছিল। সে হাত সরিয়ে নিলেও মেয়ে তা আবার টেনে নিয়েছিল নিজের কাছে। হাফ টাইমে সুমি একেবারে আলাদা। মাসি মানে মায়ের সঙ্গে কলকল করে কী কথা, মাসি কত সুন্দর ইন্ডিয়ার সিনেমা, আমাদের রজ্জাকের চেয়ে উত্তম আরও বিউটিফুল।

মা বলল, রজ্জাক আমি দেখিনি, শুনেছি ভালো, তবে উত্তমের কাছে কেউ না।

সুমি বলেছিল, মাসি ভেজিটেবল চপ খাবে?

ভেজিটেবল চপ কিনতে অনুপমের সঙ্গে সুমি বাইরে এসে বলল, তুমি একটা ক্যাবলা বাবলুদা।

অনুপম কেঁপে উঠেছিল। তারপর একদিন শুনল মেয়ে কী করতে গিয়েছিল। তখন দেখে যেন ভয় হয়েছিল। সুমির কোনও ভয় নেই। বলেছিল, মুসলমান হয়ে যেতাম না হয়, তাতে কী হয়েছে, সিনেমায় তো নামতাম, নুরুলভাই সিনেমায় নেমেছিল ঢাকায়, সাইড রোল, সে-ই বলেছিল আমি পারব, করাচি যেতে পারলে উর্দু সিনেমায় চান্স পাব, উর্দু শিখছিলাম, পাকিস্তানে উর্দু ছাড়া কিছু হবে না, উর্দু জানলে সব হবে, নুরুলভাই বলেছিল।

কে নুরুলভাই?

হাতেবর চাচার ছেলে, আমাদের গ্রামেরই, নুরুলভাই 'স্মৃতিটুকু থাক' সিনেমায় রজ্জাকের কলেজের বন্ধুদের ভিতর ছিল।

সুমির কথা যত শোনে অনুপম, অবাক। মেয়েকে দেখলে বোঝা যায় না সে কতটা আগুন নিয়ে এসেছে এদেশে। বলছে কলকাতা নয় ঢাকা যাবে। নুরুলভাই আসবে নিশ্চয় নিয়ে যেতে। সে নুরুলভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু ধীরে ধীরে নুরুলের কথা কমে আসতে লাগল, অনুপমে সে মজে যেতে লাগল। বাবলুদা, তুমিও হিরো হতে পার। বেজে উঠেছে ল্যান্ড লাইন। আবার সুমি? কথা ফুরয়নি? ফুরনোর তো নয়। এখনও মনের ভিতরে পুষে রেখেছে সেই এক বছর! এতটা জীবন ওকে কিছুই ভোলাতে পারেনি। ফোন ধরবেন না ভাবতে ভাবতে ধরলেন অনুপম। এখন চুপ করে থাকবেন। কোনও কিছুই বলবেন না। হ্যালো হ্যালো করে সুমি থেমে যাবে। কিন্তু না। ফোন করেছে চিনি। ক'দিন তাঁকে দেখেনি মর্নিংওয়াকে। কী হয়েছে তাঁর? তিনি জবাব দিয়ে ফোন রাখতে পারলেন না। চিনি বলছে, আঙ্কেল, আমার কিছু কথা আছে, আমাকে খুব ডিস্টার্ব করছে পাশের ফ্ল্যাটের লোক।

কেন? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

জানি না কাকু, আগে তো ভালো সম্পর্ক ছিল।

এখন কী হল?

বুঝতে পারছি না ঠিক।

অনুপম বললেন, তুমি জগৎ শেঠের বংশধর রতন শেঠকে বলো।

কাকু, উনি আছেন কি না এর ভিতরে জানি না।

কেন তোমার তো খুব বন্ধু।

বন্ধু কেন হবেন, গুরুভাই, আমিই মন্ত্র দিয়েছি। চিনি বলল, কিন্তু উনি ভালো না।

কী হয়েছে?

দেখুন না, এখন আর আসে না সকালে।

খেয়াল করিনি।

কাকু উনি আপনাদের মতো নন, আমাকে নিয়ে পুরী যাবেন বলছিলেন, না করেছি, মেসেজ করত খুব।

সব নিয়ে থানায় যাও, পালককে বলো।

মেসেজ তো আমি ডিলিট করে দিয়েছি, আর শেঠকাকু না-ও থাকতে পারেন, আমার নেবার।

ওই কথা নিয়েই থানায় যাও। বললেন অনুপম।

যাব, কিন্তু এই সমাজে কি একা মানুষের কোনও দাম নেই, সে কি একা থাকতে পারবে না? চিনি কথাটা বলে অপেক্ষা করতে লাগল অনুপমের জবাবের জন্য।

অনুপম চুপ করে থাকলেন। বুঝতে পারছিলেন চিনির সমস্যা। একটা মেয়ে একা থাকে বড় ফ্ল্যাটে। কেন থাকবে? তিনি একা থাকেন, কেন থাকবেন? সমস্যা প্রায় একই রকম। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে তা আরও জটিল হয়ে যায় । অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, সেই কারণে?

পাশের ফ্ল্যাটের কাকিমা কী অশ্রাব্য ভাষায় চিৎকার করে, সে আমি বলতে পারব না,আমার ফ্ল্যাটে নাকি রাতে লোক আসে, কী সব ভাষা!

অনুপম কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। চিনি একা তার গুরুর ছবি নিয়ে থাকে। তার বিশ্বাস গুরু তাঁকে নিশ্চিন্তে রাখবেন। কিন্তু তা হচ্ছে না। পাশের ফ্ল্যাটের কাকিমা কেন গালাগালি করছে তা বুঝতে পারছে না চিনি। অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, পাশের ফ্ল্যাটের কাকিমার হাজব্যান্ড কী বলছেন, তুমি ওঁকে জিজ্ঞেস করো।

দত্তকাকু এখন আমার সঙ্গে কথা বলেন না, উনি কিন্তু খুব ভালো।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, কথা বলেন না কেন?

জানি না কাকু, মনে হয় কাকিমা বারণ করেছে, আগে উনি এসে গীতা পাঠ শুনতেন আমার কাছে, গুরুর কথা শুনতেন।

কাকিমা আসতেন না?

আসতেন, শেষে কাকু একাই, তারপর তিনি বন্ধ করলেন আসা।

কবে থেকে এই সব হল?

এই মাস চার, আর সহ্য করা যাচ্ছে না কাকু।

তোমার ঠাকুর আছেন।

ঠাকুরই তো আমার শক্তি, কিন্তু আমি কী করব বলুন আঙ্কেল।

অনুপম বললেন, তুমি থানায় গিয়ে কী বলবে?

আমি বলব...কী বলব বলুন?

যা ঘটছে তাই বলবে।

বলেছিলাম তো, বলল চিনি, আগে একবার গিয়েছিলাম থানায়, এস আইকে বলেছিলাম, বলল, একা থাকা তো ঠিক না।

এবারও তাই বলবে?

তাহলে আমি কী করব?

একা থেকো না। বলতে গিয়ে কেঁপে উঠলেন অনুপম। তিনি নিজে একা থাকেন, আর এই মেয়েটি একা থাকতে পারবে না?

আমার যে আর কেউ নেই, কার সঙ্গে থাকব কাকু? চিনির গলার স্বরে বিষণ্ণতা, কাকিমা বলছে আমি নাকি উইচ, জাদুকরী, ডাইনি।

কেন বলছে, খুব খারাপ কথা। অনুপম বললেন, এইটা কি আফ্রিকার জঙ্গল, সভ্যতা বিবর্জিত গ্রাম?

কাকিমা বলছে চলে যেতে, কিন্তু আমি কোথায় যাব?

তুমি তোমার ফ্ল্যাটে থাকো, উনি এসব বললে তুমি কমপ্লেইন করো।

দেখুন কাকু, ফ্ল্যাট কমিটিকে বলেছিলাম, সেক্রেটারি বিনয়কাকু জিজ্ঞেস করল, একা থাকি কেন, কী করি একা একা, কখন ঘুমোই, সারাদিনে মোবাইলে কত কল করি।

অনুপম বললেন, এখন তুমি কী করবে?

বুঝতে পারছি না। চিনি অসহায় গলায় বলল, এমন রটিয়ে দিচ্ছে যে আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে কেউ কেউ, কাকু আমরা কি শহরে বাস করি না জঙ্গলে?

অনুপম বুঝতে পারছিলেন সব। কী বলবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। চিনি বলে যাচ্ছিল তার কথা। বলছিল, আমি বশ করি পুরুষ মানুষকে, আমি নাকি মানুষকে মেরেও...উফ আমি আর বলতে পারছি না কাকু, মা বাবাকেও নাকি আমি...।

তুমি কি থানায় এসব বলেছিলে?

না, বলতে পারিনি। চিনি বলল।

এখন বলবে? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।

কী করে বলি, খুব ডিস্টার্ব করছে বলব?

অনুপম ভাবছিলেন কী করবেন? তিনি থানায় যাবেন? কিন্তু তিনি কে? কেউ না, কিন্তু যে সাহায্যপ্রার্থী, তাকে সাহায্য করতে আসা। মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। থানায় সেই কথাই বলবেন। থানা কী বলতে পারে, দেখছে তারা। কিন্তু কতটা দেখবে। এমন গোপন প্রচার কি বন্ধ হবে?

কাকু আপনি তো একা থাকেন। বলল চিনি।

একা থাকা ঠিক না, তুমিই তো বলেছিলে।

সে তো গুরুর কথা বলার জন্য, কাকু, আমি কেন একা থাকি, কাকিমার মাথাব্যথা, বলছে আমিই নাকি আমার মা বাবাকে..., কাকু বলুন দেখি, কাকু আমার খুব বিপদ, কী ভয়ানক কথা রটাচ্ছে।

সাহস দরকার হয় একা থাকার জন্য। অনুপম বললেন, তোমার গুরু কি এখন তোমার সঙ্গে নেই?

কথা এড়িয়ে গিয়ে চিনি বলতে লাগল, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে কাকিমা, আমার চেয়ে কম করে পনেরো বছরের বড়, আমি কতবার সিনেমা দেখিয়েছি কাকিমাকে, কিন্তু হঠাৎ এত বদলে গেল, সন্দেহ করে ওঁর হাজব্যান্ডকে আমি তুক করছি।

তিনি তো আসেন না তোমার ঘরে? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, আসতে বলতে আগে?

বলতাম, আমি তো সকলকে যেমন ডাকি গুরুমন্ত্র দেওয়ার জন্য, আপনাকেও যেমন ডেকেছিলাম, উনি তাই আসতেন, কাকিমাও আসতেন, তারপর দুজনের আসাই বন্ধ হয়ে গেল, কাকিমা নিন্দা আরম্ভ করলেন, ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে গিয়ে খারাপ খারাপ কথা বলছেন।

অনুপম বললেন, সসীমকে নিয়ে কাউন্সিলারের কাছে যেতে পার।

গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার কথাই শুনলেন না, বললেন মা-বাবার ডেথ সার্টিফিকেট জমা দিতে।

কেন, ডেথ সার্টিফিকেট কী হবে?

চাপ দিতে কাকু, উনি সব জানেন, কাকিমা আমার আগেই ওঁর কাছে গেছে, কী অপমান বলুন, কাকিমা বলছে, আমি নাকি আমার মা বাবাকে মেরেছি, বাবা হার্ট অ্যাটাক, মা জ্বরে, কাকু আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

অনুপম ফোন রাখতে রাখতে বললেন, ঠিক আছে, আমি দেখছি, আমি থানায় কথা বলব।

কাকু আপনার এক বন্ধু ডেপুটি কমিশনার, শুনেছিলাম।

চাকরিতে থাকার সময় দেখা হতো, দেখি কথা বলে, রাখছি এখন। অনুপম ফোন রেখে দিলেন। মেয়েটা বিপদে পড়েছে। কিন্তু এই শহরে কেউ ওসব বিশ্বাস করবে? তিনি চুপ করে বসে থাকলেন। মেয়েটির মা বাবা মারা গেছে। সে বাবার পেনশন পায়। চাকরি নেয়নি। তাতে তার আরাধনা ব্যাহত হতো। কিন্তু অনুপমের মনে হয় সে চাকরি নিলে ভালো করত। তাহলে সারাদিন ঘরে বসে থাকত না। চাকুরে মেয়েরা সমাজে সমীহ পায়। অনুপম সসীমকে ফোন করলেন। সসীম ধরেই জিজ্ঞেস করল ভাগ্নের সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না। ভাগ্নের কথা সে ভালোই জানে। ভাগ্নেকে দেখে তার ভালো লেগেছে। শোভনের কথা শেষ হলে অনুপম বললেন চিনির কথা। সসীম চুপ করে থাকল। তারপর বলল, সে কাউন্সিলরের কাছে তাকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অলকদা আগেই সব জানত। দত্তবাবুর বউ আগেই চলে গেছে। চিনির আগে যাওয়া উচিত ছিল। অনুপম জিজ্ঞেস করতে সসীম বলল, ওর কী দরকার দত্তবাবুকে নিজের ঘরে ডাকা। সকলে তো গুরুর মন্ত্র নেয় না, আপনি নেননি, আমি নিইনি তবে একটা ছবি এনে রেখেছি মাথার কাছে, তারপর থেকে ঘুম ভালো হয়, অ্যালজোলাম খেতে হচ্ছে না।

সসীম চন্দ্র আগডুম বাগডুম বকে। তাকে থামান অনুপম, বলেন, ওর নামে খারাপ খারাপ কথা বলে বেড়াচ্ছে দত্তবাবুর স্ত্রী।

ও স্যার হবে, দত্তবাবুকে মন্ত্র দেওয়ার দরকার কী?

কী রটাচ্ছে তা জানেন?

ওর তো কোনও প্রমাণ নেই, চিনি এই নিয়ে যত শোরগোল করবে তত রটবে, চুপ করে থাকুক না।

অনুপম বললেন, এইসব কথা কি বলা উচিত?

তাঁকে অবাক করে দিয়ে সসীম বলল, ছ'মাসের ভিতর মা বাবা দুজনেই চলে গেছে, বাবার হার্টের অসুখ ছিল না, তাই-ই তো বলে চিনি, কিন্তু হার্ট অ্যাটাকে চলে গেছেন স্যার, মা গেছে জ্বরে, এই সব তো সত্যি কথা, তা বললে মানুষের মুখ আটকাবেন কী করে?

॥ বারো ॥

শোভন রয়েছে। কবে যাবে ঠিক নেই। তিনি জিজ্ঞেস করতে পারছেন না। শোভন বলছে, মামা এ পাড়ায় তোমার হেবি প্রেস্টিজ, সকলে অদ্ভুত চোখে দেখে, একা এতবড় একটা ফ্ল্যাটে থাকেন কী করে তা জিজ্ঞেস করে আমাকে। এত বড় একটা হাউজিং, সব ফ্ল্যাটে তালা। শুধু চারতলায় কারা থাকে শুনেছি, এক ফ্যামিলি, তাদের গলাও শোনা যায় না।

হ্যাঁ, তাই। ছেলে আর বুড়ি মাকে বউয়ের কাছে রেখে অবিন পুরুলিয়া। পনেরো দিনে একবার আসে। ছেলে স্কুলে যায়। অবিন থাকে ওর দাদার ফ্ল্যাটে। দাদা থাকে ইতালি। কবে ফিরবে ঠিক নেই। অবিনের বউ কখনওই নীচে তাঁর ফ্ল্যাটে নামে না। অবিন বলে যায় তার ফ্যামিলিকে অনুপমের কাছে রেখে যাচ্ছে সে। কিন্তু তা কথার কথা। অবিনের মা বেশ শক্ত-সমর্থ আছেন। শোভন এসে একদিন উপরে গিয়ে আলাপ করে এসেছে। শোভন বলে, উপরের বউদি খুব ভালো, আমি বউদিকে নিচে আসতে বলেছি, একা একা থাকে, কী সুন্দর কফি খাওয়াল।

অনুপম জিজ্ঞেস করেছেন, তোমার কাজ মিটবে কবে?

একটু সময় লাগবে, ওদের একটু চান্স দিচ্ছি, যদি কেস তুলে নেয়, না নিলে তো জ্যোতি আর নুরুলভাই একদিনে অবস্থান মঞ্চ ভেঙে কলকাতা থেকে সকলকে তাড়িয়ে দেবে।

অনুপম বললেন, তাহলে তুমি এখন ফিরে যাও।

আমি অন্য একটা সার্ভিস পেতে পারি মামা, বিনয়জেঠু বলেছে, এইটা তো আটকে আছে, আর এই চাকরি হলেও জেলায় হবে, বিনয়জেঠু বলেছে আমাকে কলকাতায় থাকতে হবে, আমার কলকাতা ছাড়া চলবে না।

টুটুল বলেছে, সে ইউএসএ ছেড়ে আসবে না। মনে পড়ল অনুপমের। তিনি বলতে গেলেন, 'কলকাতায় থাকবে কোথায়?' কিন্তু বলতে পারলেন না। তাঁর মনের ভাব আন্দাজ করে শোভন বলল, আমি কটা টিউশনি করব ভাবছি মামা, তোমাকে কিছু দেব, একেবারে ফ্রিতে তো থাকা যায় না।

অনুপম ভিতরে ভিতরে রাগে গরগর করছিলেন। কিন্তু কিছু বলতে পারছিলেন না। শোভন তখন বলল, মামা কাল অনেক রাত অবধি টুটুলদার সঙ্গে ফেসবুক চ্যাট হল, টুটুলদা খুব খুশি, বলল, চিন্তা গেছে, খুব চিন্তা করত তোমার জন্য, একা মানুষ, এত বয়স, কবে কী হয়ে যায়।

অনুপম বললেন, ওকে নিজের কথা ভাবতে বলো, চলে আসুক দেশে।

কী যে বলো তুমি মামা, আমেরিকা বলে কথা, টেক্সাস,

হলিউড, প্যাসিফিক, আটলান্টিক, পৃথিবীর রাজা ওরা, সে দেশে গেলে কেউ আসে!

কথা বাড়ান না অনুপম। খুব বকতে পারে ছেলেটা। কিস্যু জানে না। বলছে মেটিয়াবুরুজে থাকে কে এক নুরুল আর খিদিরপুরে থাকে জ্যোতি, তারা একসঙ্গে কাজ করে, ঝাড়খণ্ডের লোক দুজনেই, কী বাড়ি মামা, দেওয়ালেও মার্বেল পাথর, বলল, ওসব তুলে দিতে কয়েক ঘণ্টা, থানাকে আগে বলে রাখতে হবে, এমন ধোলাই দেবে আর সাতজন্মে এসব করতে সাহস পাবে না।

অনুপম উঠে গেলেন। তাঁর মনে হচ্ছে এই ছেলেটাকে কাউকে দিয়ে এই শহর থেকে তাড়ানো দরকার। ভাবলেন বটে এমন, কিন্তু তা নিয়ে অগ্রসর হতে পারলেন না। আসলে কতদূরে থাকে! প্রান্ত কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে এই দেশে। জেলার একটি ব্লক যেমন সদরের দিকে তাকিয়ে থাকে, জেলা সদর স্বপ্ন দেখে রাজধানী কলকাতার, কলকাতা থেকে দিল্লি কি মুম্বই, তারপর বিদেশ। এক দেশ আর এক দেশ করতে করতে সুদূর পশ্চিম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকাই যেন বেহেস্ত, স্বর্গ। তার কত নাম, ক্যালিফোর্নিয়া, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি...। এই ছেলে একদিন সেই দিকে পাড়ি দেবে এমন স্বপ্ন নিয়েই কলকাতায় প্রবেশ করেছে। যে ভাবেই হোক যাবে। যে ভাবেই হোক, ঢুকে পড়বে যেমন ঢুকেছে এই ফ্ল্যাটে। বেরিয়ে গেল শোভন। মনে হয় ভবতোষ ফোন করেছিল। যাচ্ছি বলে পায়জামার উপরে পাঞ্জাবি গলিয়ে বেরিয়ে গেল। একে অবলম্বন করেছে ভবতোষ, আবার ভবতোষকে এ। তিনি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। তখন ফোন এল বুবুলের। বুবুল জিজ্ঞেস করল, বাবা, কী করছ?

একই প্রশ্ন। তিনি বললেন, কিছু না।

বাবা তুমি কেন ফোন করো না?

তিনি বললেন, তুই তো ফোন করিস, আমি সেই জন্য করি না।

তুমি করো না বলেই আমাকে করতে হয়। বুবুল রাগ করে বলল।

অনুপম বললেন, যে কেউ ফোন করলে তো হয়, তুই করলে আমার ভালো লাগে।

শোভনদা আছে? প্রসঙ্গ বদল করে জিজ্ঞেস করল বুবুল।

বেরিয়েছে।

খুব ভালো হয়েছে বাবা, তুমি যে একা থাকতে, আমাদের খুব চিন্তা ছিল, এখন তা গেছে, শোভনদা কাল ফোন করেছিল।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

এমনি, খুব ভালো ছেলে, আমরা অনেক দিন ফেসবুকের বন্ধু, কিন্তু আমি জানতাম না শোভনদা আমাদের পিসির ছেলে।

চুপ করে থাকলেন অনুপম। বুবুল আরও খবর দিল, পিসিও ফোন করেছিল, পিসি খুব ভালো বাবা, মা চলে গেছে জানতই না পিসি, বলল, তাঁকে কোনও খবরই দেওয়া হয়নি।

অনুপম বললেন, এত কথা হয়েছে?

বুবুল বলল, তোমাদের বসিরহাটের বাড়িতে নাকি এক বছরের উপর ছিল।

অনুপম এবার কঠিন হলেন, আমাদের নিজেদের কেউ তো নয়।

নিজেদের চেয়ে দূরের আত্মীয়ই ভালো, আমার খুড়শ্বশুর তো মামলা করেছে জমি নিয়ে, অথচ আমার শ্বশুরমশায় ভাইদের জন্য কত কিছু করেছেন, তাদের পড়িয়েছেন উনি।

একই কথা। একই রকম। সব পরিবারে এমন কথা আছে। তিনি বিরক্ত হলেন। এখন একটু নিজের ভিতরে ডুব দিতে ইচ্ছে করছে। বুবুল একদিন বলেছিল, তার দাদার অভিযোগ, মায়ের চিকিৎসা খুব ভালো করে হয়নি, টাকার দরকার হলে বাবা চাইতে পারত, অতি সাধারণ নার্সিংহোমে দেওয়ার জন্যই তাদের মা চলে গেছে। কলকাতার সেরা হাসপাতালে কেন দেওয়া হয়নি তাদের মাকে? শুনে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন মেয়েকে, তার মত কী? বুবুল বলেছিল বড় নার্সিংহোম কিংবা হাসপাতালে হয়তো মা সেরে যেত। তার মানে তারও সেই বিশ্বাস। বাবা চিকিৎসা করেনি ঠিক মতো। তারা কেউ হাজির ছিল না। বুবুল দিল্লি থেকে এসেছিল। কিন্তু সে তো দেখতে আসা। জামাই আসতে পারেনি। টুটুল আসতে পারেনি। অত দূর থেকে আচমকা চলে আসা তো যায় না। টাকা পাঠিয়েছিল। কিন্তু টাকা তো তাঁর নিজেরও ছিল। অবসরের পর পাওয়া টাকা ব্যাঙ্কে ঘুমিয়ে আছে। তিনি জানতেন কালান্তক সেই অসুখে কেউ ফেরে না। ধন্বন্তরি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের চেম্বারে ছ-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রোগ যন্ত্রণা কমাবার ওষুধ নিয়ে এসেছিলেন তিনি। বড় ডাক্তারদের বিশেষভাবে ডেকে এনে দেখিয়েছিলেন।

তিনি বললেন, তোদের এত চিন্তা কেন আমাকে নিয়ে?

কী বলছ বাবা, তুমি সত্যিই বদলে যাচ্ছ। বুবুল বলল।

এই শোভনকে কি টুটুল পাঠিয়েছে?

বুবুল বলল, কেন, কী হয়েছে?

ছেলেটা এখানে থাকবে?

থাকলে কী হয়েছে, কলকাতায় তো কোনও শেল্টার নেই শোভনদাদের।

কলকাতায় আমাদের শেল্টার কবে হল, এই সেদিন, ও আমার সঙ্গে থাকবে কেন, বাড়ি ভাড়া করে থাকুক।

কী যে বলো বাবা, পিসি একবছর ছিল আমাদের বাড়ি, আর তার ছেলে এসে থাকতে পারবে না? অবাক কণ্ঠে বুবুল বলল, ওপারে তোমাদের বাড়িতে কত লোক এসে থাকত বলেছ, কত পাত পড়ত!

তিনি বললেন, ছেলেটা ভালো না।

কী করেছে সে, চাকরির জন্য এসেছে, ভালো না বলছ কেন, আমরা তাকে সাহায্য করব না?

অনুপম বললেন, ও ফিরেছে, থাক এখন। বলতে বলতে ফোন কেটে দিলেন তিনি। শোভন ফেরেনি। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছে। তার মানে পাড়ায় একটা জায়গা করছে সে। সঙ্গে ভবতোষ। অনুপম চেয়ারে বসে থাকলেন। তিনি আজ আর বাইরে নেই। ভিতর থেকে ব্যালকনিতে আসেননি বৃদ্ধা। কোথাও গেলেন? ব্যালকনির দরজা বন্ধ। অনুপম উদ্বিগ্ন হলেন। জানালাও বন্ধ। তাহলে? অসুস্থ হলেন নাকি? অসুস্থ হতেই পারে। তিনি বসে থাকলেন ব্যালকনিতে। একটু বাদে শোভন ফিরল। সঙ্গে ভবতোষ। ভবতোষ টুটুলের ঘর মানে যা এখন শোভনের ঘর হয়েছে, সেখানে ঢুকে গেল। এর মানে শোভন চাবি নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে। শোভন বুদ্ধিমান। যেন সে তাঁর মনের ভাবটি আন্দাজ করতে পেরেছে। কিন্তু এই চাবি নিয়ে বেরনো শোভনের অনধিকার। চাবি তিনি নিজের কাছে রেখে দেবেন। শোভন ব্যালকনিতে এল, বলল, আমি অঙ্ক করাতে পারি ক্লাস টেন অবধি, মাধ্যমিকে লেটার ছিল, তারপর কমার্স নিলাম, কিন্তু আমার টিউশনি পেতে অসুবিধে হবে না মামা, ভবতোষদা দেখছে কলকাতায় রেটও ভালো, আমাদের ওখানে দামই নেই টিউশনির।

আমি তো বেরিয়ে পড়ি মাঝেমধ্যে, তখন তোমাকে তো বাড়ি ফিরতে হবে। অনুপম বললেন।

কেন মামা, আমাকে চাবি দিয়ে যেও, আমি ফ্ল্যাট দেখব।

তিনি চুপ করে থাকলেন কিছু সময়, তারপর বললেন, তুমি তো এগজামের জন্য আসবে বলেছিলে।

পরিস্থিতি বদলে গেছে, টুটুলদাও চায় আমি তোমার সঙ্গে থাকি, নাহলে টুটুলদা তোমাকে ইউ এস এ নিয়ে যাবে।

অনুপম ক্রুদ্ধ হয়েছেন। মনে হচ্ছে ছেলেটি তাঁকে শাসাচ্ছে। কী একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সংবরণ করলেন অনুপম। তারপর নরম গলায় বললেন, এই ফ্ল্যাটে টিউশনি করা তো হবে না।

না মামা, ব্যাচে পড়াব একজনের বাড়িতে, এখানে পড়ালে অবশ্য ভালো হতো, কত জায়গা।

ঠিক হয়ে গেছে? জিজ্ঞেস করলেন অনুপম।

ভবতোষদা বলল তাই, এখানে সুবিধে হতো অনেক, কিন্তু তোমার অসুবিধে হবে মনে হয়, তাই বাইরেই পড়াব।

অনুপম হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, সামনের বাড়ির দোতলায় একজন থাকেন জানো?

ওল্ড লেডি, উনি কি ব্লাইন্ড?

কেন, তোমাকে কেউ বলেছে কিছু?

ভবতোষদা বলছিলেন, ব্লাইন্ড লেডি ব্যালকনিতে বসে বোঝাতে চান উনি ব্লাইন্ড নন।

এভাবে কথা বলে না, যাও তো খোঁজ নিয়ে এসো, ক'দিন উনি ব্যালকনিতে আসেননি।

কী খোঁজ নেব? শোভন অবাক।

উনি কেন ব্যালকনিতে নেই, অসুস্থ হলেন?

ভবতোষদাকে নিয়ে যাই? শোভন বলল।

ভবতোষকে নিয়ে গেল শোভন। তিনি ব্যালকনিতে বসে দেখলেন ওরা নিচে নেমে বাড়িটির গায়ের গলিপথে ঢুকে গেল। সামনে একতলায় যে বারান্দা তার গ্রিলগেটে তালা। এই বারান্দা বহুদিন বন্ধ। একতলায় আগে ভাড়াটে ছিল। তারা চলে গেছে আট-ন'মাস আগে। তারপর থেকেই বন্ধ। ওরা ভিতরে গিয়ে বেশ কিছু সময় বাদে ফিরল। ফিরে এই ফ্ল্যাটে এল না। মনে হয় চা খেতে গেল। ওদের ফিরতে একঘণ্টার উপর লেগে গেল। ভবতোষকে নিয়েই ফিরল শোভন, বলল, মামা সব জেনে এলাম, ভবতোষদা সবাইকে চেনে তো।

ভবতোষকে ডাকল শোভন। ভবতোষ একটু কুঁজো হয়েই এল। বলল, স্যার, ওই বাড়ি প্রোমোট হবে জানেন না, আপনি ফ্ল্যাট নেবেন, এটা তো ভাড়াবাড়ি।

কিন্তু উনি কোথায় গেলেন?

ভবতোষ বলল, কাউন্সিলরের ভাই প্রমোট করছে, লালুদা।

বিরক্ত হলেন অনুপম, বললেন, কিন্তু ওঁর কি শরীর ভালো নেই?

চলে গেছেন, বাড়ি ভিতরে ভিতরে ভাঙা হবে, আগে দোতলা, বাইরে থেকে বোঝা যাবে না প্রথমে, 'লেবার' এসে গেছে।

তার মানে? বাড়িটা ভেঙে দেবে?

ইয়েস স্যার, সেই জন্য ওঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দুদিন আগে।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওঁকে?

কাশীপুরের দিকে। ভবতোষ বলল, মেয়ে জামাইয়ের ব্যবস্থা, কতদিন তারা ওয়েট করবে?

শুনেছি ওঁর আপত্তি ছিল?

আপত্তি করে লাভ আছে, ওই অতবড় বাড়ি নিয়ে উনি করবেন কী?

ফ্ল্যাটটা ভালো? জিজ্ঞেস করলেন অনুপম।

ছোট, ওয়ান রুম, দেখে এলাম।

দেখে এলেন মানে?

কাশীপুর গেলাম অটো ধরে, খুপরির মতো ওয়ানরুম, আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে সব সময়।

ব্যালকনি আছে, গঙ্গা তো ওদিকে?

গঙ্গার দিকের জানালা পাশের বাড়িতে আটকে গেছে, নো ব্যালকনি স্যার। কোনও ব্যালকনি নেই এই ফ্ল্যাটে। ভবতোষ বলল স্তিমিত গলায়।

॥ তেরো ॥

তাইই তো হবার কথা, মেয়ে জামাই আর অপেক্ষা করতে পারছিল না, জামাই শেষে শাশুড়ি মাকে একটা ছোট ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দিয়ে বাড়ি প্রমোটারের হাতে দিয়ে দিল। ভবতোষ হাত কচলে বলল। হাত কচলানো ওর স্বভাব। বলছে, জামাই খুব ভালো, এ পাড়ারই ছেলে, থাকে লাতুর জেলা শহরে। মহারাষ্ট্র। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ, ও জীবনে ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয়নি, জামাই শাশুড়ি মাকে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু শাশুড়ি মা যাননি। মেয়ের কাছে গিয়ে না থাকতে বলে গিয়েছিলেন ওঁর স্বামী। তাই না গিয়ে বাড়ি নিয়েই ছিলেন। নিজে পেনশন পান, স্বামীর জমানো টাকাও আছে। কিন্তু কী হল, জামাই-মেয়ে ওঁকে এখান থেকে সরাতে পারছিল না। বৃদ্ধা জানতেন মেয়ের কাছে গেলে ফিরে এসে আর দেখতে পাবেন না বাড়ি। দেখতে আর কী পাওয়া? ক্ষীণ দৃষ্টি। কিন্তু বাড়িকে চেনেন স্পর্শে। গন্ধে। ভবতোষ বলল, মহিলা খুব ঠেঁটা, বলেন দেওয়ালে হাত ঘষলে স্বামীর ছোঁয়া পান, ছেলের ছোঁয়া পান, এখন কী করবেন?

ঠিক হয়নি এইটা। অনুপম বললেন।

তাই বলে দেওয়ালে হাত ঘষার জন্য বাড়িটা আটকে রাখবে, আমার ঘর নেই নিজের, কত লোকের ঘর নেই, আর অতবড় বাড়িটা একা নিয়ে বসে থাকবেন? ভবতোষ বলল, প্রোমোটার লাখ আট টাকা দেবে আর দুটো ফ্ল্যাট।

অনুপম বললেন, থাক ভবতোষবাবু, আর কিছু বলতে হবে না।

একা মানুষের ওয়ান রুমই যথেষ্ট, ওঁর সঙ্গের কাজের মেয়েটি অবশ্য ভালো, ওকে চিনি আমি, মরিয়ম, কেউ নেই ওর।

শোভন উৎসাহিত হয়ে বলল, যত বয়স হয়, মানুষ তত ঠেঁটা হয়, কী করতে বাড়ি আগলে ছিলেন উনি, ক'দিন আর বাঁচবে বুড়ি।

আহ্, চুপ করবে, আমি বেশি কথা পছন্দ করি না। অনুপম বললেন।

তখন ভবতোষ বলল, বুড়ির আচার-বিচার ভালো না, জামাইয়ের আপত্তি সত্ত্বেও মরিয়মকে ছাড়াননি উনি, আমি জানি সব, আমি বলেছিলাম আমি বরং লোক দেখে দিচ্ছি, মরিয়মকে ছাড়িয়ে দিন, আমি না হয় থাকব, কিন্তু উনি বড় ঠেঁটা, না করে দিল, ওঁর পুজোর ফুল আনবে মরিয়ম, শনি পুজো দিতে যাবে মরিয়ম, এ হয়? ভবতোষ বলল।

ঠিকানা এনেছেন? জিজ্ঞেস করলেন অনুপম।

আপনি যাবেন কাশীপুর?

না, কিন্তু রেখে দেওয়া ভালো, প্রতিবেশী তো।

বাইশের বি চন্দ্র মল্লিক লেন, সোজা খুব, চন্দ্রমল্লিকা ফুলের ম্যাস্কুলিন জেন্ডার। বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগল শোভন, মামা, মল্লিক থেকে তো মল্লিকা?

অনুপম বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন না। বললেন, ঠিকানাটা নোট করে রাখো, দরকার লাগতে পারে, মেয়ে জামাই মহারাষ্ট্রতে, তাদের মাকে বাড়ি থেকে তুলে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে গেল, বাড়ি ভাঙবে, এটা ঠিক হয়নি মনে হয়।

ভবতোষ বলল, ঠিকই হয়েছে, এ পাড়ায় আর একটা ফ্ল্যাট বাড়ি হবে, উন্নয়ন, আপনি কতকাল ভাড়াবাড়িতে থাকবেন, লালুদাকে বলে কমে করিয়ে দেব, বলেন তো লালুদাকে নিয়ে আসব এখেনে।

অনুপম প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে বললেন, আর কবছর বাঁচতেন উনি?

দেখুন স্যার, কর্পোরেশন থেকে প্ল্যান পাশ হয়েছে, মেয়ে জামাই আর কত অপেক্ষা করবে, কাউন্সিলর সব জানেন, তাঁর ভাই করছে তো।

আপনি কি ওই বাড়িতে থাকার কথা ভেবেছিলেন? জিজ্ঞেস করেন অনুপম।

না, তা ঠিক নয়। বলল ভবতোষ, আমি যাই স্যার, দেরি করে

গেলে ভাতে জল দিয়ে দেবে। বলতে বলতে ভবতোষ বেরিয়ে যায়। শোভন তার ঘরে যায়। অনুপমের মন খারাপ হয়ে যায়। অনেক সময় তিনি বসেই থাকেন। সেদিন বেলা পড়তে তাঁর মনে হয় চন্দ্র মল্লিক লেনে যাবেন। কিন্তু যাওয়া হয় না। অনুপম সেদিন বের হন না। মনে হচ্ছিল তিনি বেরলেই ভবতোষ আর শোভন মিলে জোর আড্ডা বসাবে, পাড়ার আর কেউ কেউ আসবে। এখন ভাত খেয়ে ঘুম মারছে শোভন। তাকে রেখে যাওয়া মানে চাবি তার কাছে রেখে যাওয়া। চাবির আরও দুই সেট আছে। কিন্তু তা বের করবেন না তিনি। চাবি হাতে পেলে শোভন তার অবস্থান পাকা করে ফেলবে। শোভন ঘুম থেকে উঠল যখন বেলা পড়ে গেছে। উঠে বিস্মিত হল, তুমি বেরোওনি মামা?

তিনি বই মুখে ইজিচেয়ারে এলিয়ে ছিলেন। শোভন উত্তরের অপেক্ষা না করে বলল, পড়তে পড়তে বুঝতে পারোনি তো বেলা পড়ে গেছে।

অনুপম বললেন, তুমি তো বেরবে?

হ্যাঁ, সন্ধের শো দেখতে যাব লেকটাউন জয়া সিনেমায়, 'কলঙ্কিনী রাই', আমি আর ভবতোষদা।

শোভন চলে যেতে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি ব্যালকনিতে গিয়ে দেখলেন বাড়িটি টিনে ঘেরা হয়ে গেছে সামনের দিক, রাস্তার একটুখানি অধিকার করে নিয়েছে প্রোমোটার। বাড়িটি ভাঙার আয়োজন সম্পূর্ণ। এই যে আবাসনে আছেন তিনি, এও ছিল এক ধনী ব্যক্তির বাগান বাড়ি। অনেকখানি জমি, পুকুর, বাগান। শুনেছেন তিনি। সুতরাং সামনের বাড়ি যে ভাঙা হতে পারে এ নতুন কিছু নয়। কিন্তু তিনি কেমন বিব্রত বোধ করছিলেন। তাঁর একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল ব্যালকনিতে বসা। প্রায় অন্ধ নারী এবং তিনি পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকতেন। শোভন আসার পর সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শোভন এসেই যেন সামনের বাড়ি ভাঙার ব্যবস্থা করল। এতদিন আটকে ছিল। চিনি এতদিন তো কিছুই বলেনি। হাসিখুশি মেয়েটি তার গুরুদেবের মন্ত্র নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। এখন তার নামে যে অপবাদ রটছে...চিনি ফোন করছে। তিনি ফোন বেজে যেতে দিলেন। তিনি বেরিয়ে পড়বেন ভাবলেন। সন্ধে হয়ে গেল প্রায়, তবু। চন্দ্র মল্লিক লেনেই যাওয়া স্থির করলেন। ফ্ল্যাটে তালা দিতে দিতে বুঝতে পারলেন, শোভনের জন্যই এত সময় বেরতে পারেননি। নীচে নেমে বড় রাস্তায় গিয়ে অটো ধরলেন। কাশীপুর জায়গাটি শ্রমিক অধ্যুষিত। রেল ইয়ার্ড, ধুলোবালি। বিহারি মজুরটোলি এখানে। এখানেই এক বস্তি পুড়িয়ে বছর কুড়ি আগে যে আবাসন তৈরি হয়েছিল তাই চন্দ্র মল্লিক লেন। সন্ধ্যা হয়েছে। কিন্তু কলরব খুব। ফ্ল্যাট নং ২২/১৩, বড় আবাসনে খুঁজতে খুঁজতে ২২/১৩ পেয়ে গেলেন। সাত মানে চারতলায়। এই বহুতল বাড়িটি বস্তি-উচ্ছেদ গরিব মানুষ আর শ্রমিকদের জন্য তৈরি হয়েছিল। তাদের ফ্যামিলিতে দশ জন থাকলেও ওয়ান রুম। এক একটি তলায় যেখানে দুটি ফ্ল্যাট থাকার কথা একই বিল্ডিঙে চারটি। সরু সিঁড়ি, মিটমিটে আলো। যাদের দেওয়া হয়েছিল এইসব ফ্ল্যাট, তারা তা বিক্রি করে কোথায় হারিয়ে গেছে। দেশে চলে গেছে কিংবা আর ঝুপড়ির বাসিন্দা হয়েছে। চারতলা অবধি উঠতে তাঁকে থামতে হল কয়েকবার। সিঁড়িভাঙা তাঁর অভ্যেসে নেই। তাঁদের আবাসনে লিফটিকে জায়গায় দাঁড়িয়ে মহম্মদ রফির গান শুনলেন। জাপান...লাভ ইন টোকিও। লে গয়ে দিল, গুড়িয়া জাপান কি, পাগল মুঝে কর দিয়া...। তিনি গান শুনতে শুনতে উপরে উঠে এলেন। এখনও এখানে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের গান বাজে। কোনও বৃদ্ধ হয়তো শুনছেন। তিনি চারতলায় এসে দাঁড়ালেন। নীচের গান উপরে উঠে আসছে। একটি ফ্ল্যাটের গায়ে চক দিয়ে লেখা, নীরজ মাহাতো। সবগুলির নাম রয়েছে। একটিতে নেই। তিনি আন্দাজ করে সেই ফ্ল্যাটে টোকা দিলেন। ডোর বেল নেই। কয়েকবার টোকার পর দরজা খুলেছে যে তাকে তিনি চেনেন। মরিয়ম। আধ ময়লা সাদা শালোয়ার কামিজ পরা। মরিয়ম তাঁকে দেখে অবাক, এ কী বাবু আপনি যে?

তোমরা চলে এলে এখানে। বলতে বলতে অনুপম ঢুকলেন ভিতরে। মরিয়ম বলল, আগের দিন বলল, আমাদ্দের টায়েম দেয়নি, দুদিন আগে ভোর রাতে এসে দিয়ে গেছে, মা'র জামাই এয়েছিল, বলল, গঙ্গার ধারে ফেলাট, বারান্দায় বসে গঙ্গা দেখা যায়, দক্ষিণেশ্বর মন্দির দেখা যায়, মিথ্যেবাদী।

অনুপম দেখলেন তিনি কালো চশমা চোখে বসে আছেন একটি চেয়ারে। সামনে পাঁচ ফুট দূরে দেওয়াল। অনুপম ঘুরে তাঁর সমুখে যান, বললেন, আমি উলটো দিকে থাকি, শুনে এলাম।

তিনি বললেন, জানি, ব্যালকনিতে অনেক সময় বসে আমাকে দেখো।

হ্যাঁ, আপনিও আমাকে দেখেন মনে হয়।

তিনি বললেন, আমার মনে হতো কেউ আছে রাস্তার ওপারে। সে কে, তা জানতাম না।

মরিয়ম বলল, অতবড় বাড়ি, অমন বারান্দা, এ জায়গা কি থাকার উপযুক্ত?

জামাই চলে গেছে? অনুপম জিজ্ঞেস করেন।

শাউড়ি মারে উচ্ছেদ করতি এয়েছিল প্লেনে চেপে, প্লেনে চেপে চলে গেছে শাউড়ি মারে পেন্নাম করে। মরিয়ম খরখর গলায় বলল।

অনুপম বললেন, বাড়ি তো আপনার?

আমার স্বামীর, এখেনে এ দেওয়ালে তাঁরে পাব না। বলতে বলতে বৃদ্ধা চুপ করে গেলেন।

মরিয়ম বলল, ঠাকমা দেয়ালে হাত ঘষত, তেনার সোয়ামীর করা বাড়ি তো, দেয়ালে নাকি তাঁর গা ছুঁয়া যেত।

অনুপম কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। বৃদ্ধা চুপ করে থাকলেন। মরিয়ম বলল, আল্লার এ কী বিচার, একটা বারান্দা ছিল, তাও কেড়ে নেছেন, এত অধর্ম কোনও ভগবান সহ্য করবে না।

অনুপম বললেন, আমার সঙ্গে যাবেন, আমার ফ্ল্যাটে থাকবেন।

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, বললেন, মেয়ে জামাইয়ের মান থাকবে না, আর চোখের সামনে বাড়িটা ভাঙবে, সহ্য করতি পারব না, তুমি বারান্দা বন্ধ করে রেখে দিও।

দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে তিনি বসে থাকলেন। বেরিয়ে আসবেন যখন অনুপমকে ডাকলেন বৃদ্ধা, বললেন, আমি ভালো আছি, ভালোই আছি, এখেনে বসে পুরনো গান শোনা যায়, ওখেনেও তোমার ঘর থেকে ভেসে আসত, এখেনেও তা আছে, মহেন্দ্র কাপুর, কিশোরকুমার, মহম্মদ রফি, এই যে এখন মহেন্দ্র কাপুর বাজছে।

অনুপম অবাক। মহেন্দ্র কাপুরের গান। কিন্তু ঘরে তো শোনা যাচ্ছে না। মরিয়ম যেন তাঁর কথা বুঝল। বছর চল্লিশের মরিয়ম বলল, ঠাকমাই শুধু শুনতে পায়, উনি তো সন্ধে থেকে শুনছেন।

সত্যি গান শুনছেন? অনুপম জিজ্ঞেস করল গলা বাড়িয়ে।

তিনি বললেন, হামরাজ, মহেন্দ্র কাপুর, এ নীলে গগন কি তলে...বড় ভালো, আমার এসব রেকর্ড ছিল, আমাদের দুজনের খুব গান শোনার শখ ছিল।

কিন্তু ঘরে তো শোনা যাচ্ছে না।

শুনতে পাচ্ছি। বলে বৃদ্ধা থামলেন। অনুপম বেরিয়ে এসে শুনতে পান। হ্যাঁ, মহেন্দ্র কাপুর। অনুপম মহেন্দ্র কাপুর শুনতে শুনতে নেমে আসেন। কী অদ্ভুত! মহেন্দ্র কাপুরের গান তার সঙ্গে চলতে থাকে। বাড়ি ফিরতে রাত সাড়ে নটা। দেখলেন আবাসনের সামনে শোভন দাঁড়িয়ে। শোভন বলল, তুমি তো বললে বেরবে না, কোথায় গিয়েছিলে মামা?

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সিনেমা দেখেছ?

না, ভবতোষদা শেষ অবধি যায়নি, বাড়িতে ক্যাঁচাল হয়েছে।

অনুপম বললেন, আমার ফেরা তো এমনি হয়, তুমি কী করবে

তুমি ঠিক করো।
আমি বাইরেই থাকব, কিন্তু ডুপ্লিকেট চাবি নেই মামা?
অনুপম লিফ্টে উঠতে উঠতে বললেন, আছে, তিনটে চাবি মোট।
তাহলে তো চিন্তা নেই, আমাকে একটা দিও।
নেই, একটা টুটুলের কাছে, আর একটা বুবুলের কাছে, আমার এই একটাই।
অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে শোভন। বিশ্বাস করেনি। লিফ্ট থেকে নেমে বলল, টুটুলদা আমেরিকায় চাবি নিয়ে গেল, তা হয় নাকি মামা?
ফ্ল্যাট খুলতে খুলতে অনুপম বললেন, ওর মায়ের মৃত্যুর পর এসেছিল তো, তখন চাবি নিয়ে বেরত, ফিরে যাবার সময় নিয়ে গেছে ভুল করে।
শোভন আর কোনও কথা বলল না। কিন্তু অবিশ্বাস করেছে তা স্পষ্ট। অনুপমের মনে হল তাঁর অজ্ঞাতে শোভন চাবি হাতিয়ে নিতে পারে। তখন তো অন্য চাবি বের করতে হবে। তিনি ঠিক করলেন চাবি নিজের কাছেই রাখতে হবে। রাতে কোনও কথা হয়নি দুজনের ভিতর। শোভনের অস্বাভাবিক নীরবতা তাঁকে উদ্বিগ্ন করল। পরদিনও শোভন কিছু বলল না। টুটুলের কাছে জিজ্ঞেস করলেই টুটুল বলবে, তার বাবার কোথাও ভুল হচ্ছে। চাবি কি হারিয়ে গেল? ক'দিন বাদে শোভন সকালেই বের হতে হতে বলল, আজ বাইরে লাঞ্চ, আজ ফাইনাল হবে মামা।

॥ চোদ্দো ॥

''এই প্রস্ফুট বন-কুসুম-গন্ধ আমার মনে মাঝে মাঝে কেমন একটা বেদনা জাগায়, যেন কী পেয়েছিলুম, হারিয়ে ফেলেছি। এই উদীয়মান সূর্যের অরুণ রাগ অতীত দিনের কত কথা মনে এনে দেয়...''
অনুপম দৃষ্টিপ্রদীপ পড়ছিলেন আবার। কল্পনায় নিজেকে দৃষ্টিপ্রদীপের জিতুর জায়গায় বসিয়ে সুখ পান। শোভন বেরিয়ে যেতে অনেক নিশ্চিন্ত হয়ে বই নামিয়েছিলেন অনুপম শেল্ফ থেকে। ব্যালকনির ওপারের বাড়ি ভাঙা শুরু হয়েছে দোতলা থেকে। সামনের অংশ মানে সেই শূন্য ব্যালকনি অটুট আছে। পেছন দিক ভাঙা হচ্ছে। তাঁর মনে হচ্ছিল যখন সমস্ত পৃথিবীর ইঞ্চি ইঞ্চি জায়গা ভর্তি হয়ে যাবে ইট-কাঠে, নদী, বনভূমি, প্রান্তর মুছে যাবে সব, তখন মানুষই সব আবার ভাঙতে শুরু করবে। ডোর বেল বাজল। ফিরে এল নাকি শোভন? আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন তিনি। ফাইনাল বন্ধ। কীসের ফাইনাল? তাঁর পড়া বন্ধ হল। সামনে বসে অজ্ঞানতা জাহির করবে। বলবে, শেক্সপিয়র পড়েছ মামা, হেভি গপ্পো, আর সোমেন লাহার বই, রবি ঠাকুরের সঙ্গে বউদির প্রেম। উফ! ফাটাফাটি। একদিন বলে, মামা শান্তিনিকেতনের খোয়াই নদী কি খুব বড়? রবি ঠাকুরের সম্পত্তি ওসব। হ্যা হ্যা করতে থাকবে। তিনি দরজা খুলতেই দেখলেন চারতলার অবনের বউ তন্দ্রিমা। কাকু আসব?
এসো, কী ব্যাপার, অবনের মা ভালো আছেন তো?
হ্যাঁ। বলতে বলতে ভিতরে ঢুকে তন্দ্রিমা বলল, কাকু উনি আপনার ভাগ্নে?
সরাসরি নয়, কেন কী হল, চাকরির পরীক্ষা দিতে এসেছে।
কাকু, আমার খুব লজ্জা করছে বলতে, উনি কেমন মানুষ? তন্দ্রিমা মাথা নিচু করে বলল।
একদিন উপরে গিয়ে কফি খেয়ে এসেছে শুনলাম।
কাকু, আপনি আমার হোয়াটস আপ নম্বর চেয়েছিলেন?
না তো। অনুপম উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, ও কি তাই নিয়েছে?
হ্যাঁ কাকু, আমি দিলাম, বাট হি ইজ সেন্ডিং ব্যাড মেসেজেস, ব্যাড মেসেজ অ্যান্ড পিকচারস, গতকাল আমাকে সিনেমায় যেতে বলেছিল, আমি জবাব দিইনি।
অনুপম বললেন, কী খারাপ, ব্লক করা যায় না?
করেছিলাম, কাল অন্য ফোন থেকে মেসেজ দিয়েছে, ভয়ানক ডিস্টার্বিং। চোখ মুছতে লাগল তন্দ্রিমা।
অনুপম বললেন, হি ইজ আ লুম্পেন, আমি ওকে তাড়িয়ে দেব।
তন্দ্রিমা বলল, ও নাকি পার্টি করে, আমাকে বলছে আপনার ছেলেরই মতো ...।
অনুপম কাঁপতে লাগলেন উত্তেজনায়। ছি ছি ছি। ছেলেটা অন্তত আটটা ইরোটিক লাভ মেসেজ দিয়েছে। বলছে মামা যখন থাকবে না ফ্ল্যাটে আসতে। ফ্ল্যাটের চাবি সে নিয়ে নেবে মামার কাছ থেকে। তন্দ্রিমা বলল, সে তার স্বামীকে আসতে বলেছে।
অনুপম বললেন, তিনি ব্যবস্থা নেবেন।
ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু কী ব্যবস্থা? তন্দ্রিমা চলে যেতে তিনি খুব বিহ্বল বোধ করলেন। এখন কী করবেন? শোভনকে বললে, ও অস্বীকার করে বলবে ওই তন্দ্রিমাই তাকে বলেছিল সিনেমা দেখার কথা। এক হাতে তালি বাজে নাকি? শোভন ফিরল আচমকা। ও কি টের পেয়েছে যে তন্দ্রিমা আসতে পারে! শোভন ওসবের পরোয়া করে বলে মনে হয় না। অনুপম ভেবেছিলেন সুমিকে ফোন করে বলবেন, কিন্তু শেষ অবধি বিরত হন। মাতৃস্নেহে বিশ্বাসই করবে না। অনুপম অপেক্ষা করছিলেন শোভনের জন্য। রাগে তাঁর শরীর কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে দূরে কোথাও চলে যান। শোভন ঢুকতে ঢুকতে বলল, মামা টিভি খোলো টিভি খোলো।
কেন কী হয়েছে? বিরক্ত হলেন অনুপম।
চারটে চ্যানেল ছিল, দেখি কিছু দেখাচ্ছে কি না। শোভন উত্তেজিত।
কী বলছ কী, বুঝতে পারছি না।
শোভন নিজেই টিভি খুলে দিল। সাউন্ড বাড়িয়ে দিয়ে সোফায় বসে পড়ল। তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। কী ভাবে প্রসঙ্গের সূচনা করবেন তা ঠিক করতে পারছিলেন না। রুচিতে বাঁধছিল। তখন শোভন চিৎকার করে ওঠে, ক্যালানিটা দ্যাখো মামা, সব ফুটে গেছে, অ্যাকশন হয়ে গেছে মামা, দেখো দেখো, আজ ধর্না ভেঙে দেওয়া হল, এর নাম ফাইনাল।
ফাইনাল হচ্ছে ঠিক দুপুরে। প্রকাশ্য দিবালোকে। ধর্না মঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়েছে লেঠেলের দল । টেলিভিশন দেখাচ্ছে। রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একদল যুবক। মাথা ফাটল একটি মেয়ের। মাথা চেপে বসে পড়েছে সে। টেলিভিশনকে জানানো হয়েছিল আজ আপস মীমাংসা হবে। মিটিং হয়েছে। মিটিংয়ে শোভন ছিল। মিটিংয়ে ফয়সালা হয়নি।
ওই দ্যাখো মামা, মিটিং..., মিটিংয়ে কিছু না হতে আমি অর্ডার দিয়ে চলে এসেছি, শোভন গর্জন করতে লাগল, মার শুয়োরের বাচ্চাদের, মেয়েগুলোকে বেশি করে ক্যালা, জামা-কাপড় খুলে দে, সব পতিবাদ ভিত্তারে চলে যাবে।
আহত একটি মেয়ে গর্জন করছে, মেরে ফেললেও ছাড়ব না, অন্যায়ের প্রতিকার চাই।
শোভন চাপা গলায় বলল, তুলে নিয়ে গিয়ে মাপলেই তোর ক্যাদ্দানি চলে যাবে শালী।
যাব না, আমরা এখেনেই থাকব। মেয়েটি গর্জন করল বাঘিনির গলায়, লড়াই লড়াই লড়াই চাই।
মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যা ভজনদা, তুলে মেসে নিয়ে যা, শালীকে বুঝিয়ে দে।
অনুপম থামাতে চাইলেন শোভনকে, বললেন, বন্ধ করো, খারাপ কথা আর চিৎকার করবে না, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।
শোভন বন্ধ করল না, কিন্তু সাউন্ড মিউট করে দিল। টিভিতে রক্তারক্তি দেখাতে লাগল। তারপর অন্য খবর শুরু হতে শোভন বন্ধ করে দিল টিভি, একটু নরম গলায় বলল, তোমার প্রেস্টিজের জন্যই আমি চলে এলাম মামা, যদি টিভি ক্যামেরায় দেখিয়ে দেয়, আমি নেই ওর ভিতরে।

মিটিংয়ে আছ তা তো দেখাল এক ঝলক। অনুপম গর্জন করলেন।

আরে রাগ করছ কেন মামা, মিটিংয়ে থাকা আর ক্যালানি এক নয়, আমি ভেবেছিলাম দাঁড়িয়ে দেখব, আর ওই মেয়েটাকে দেখে নেব, কিন্তু পরে ভাবলাম ঠিক হবে না, তোমার পেস্টিজ আছে।

তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। গম্ভীর গলায় অনুপম বললেন।

তুমি ফালতু রেগে গেছ মামা, আমি তো নেই এর ভিতরে, আমি শান্তিপূর্ণ মিটিং করে আদেশ দিয়ে চলে এসেছি। শোভন বলল। আরও বলল, গভমেন্ট চায় ধর্না উঠে যাক।

তুমি তন্দ্রিমাকে কী বলেছ? প্রসঙ্গ বদলে দিলেন অনুপম। রাগে তাঁর ভিতরটা জ্বলছিল।

কে তন্দ্রিমা? ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল শোভন।

চারতলার অবনের ওয়াইফ তন্দ্রিমাকে তুমি মেসেজ করো?

কী যে বলো মামা, আমি কি চিনি অবন বলে কাউকে, উপরের বউদি কফি খেতে ডেকেছিল, সেও তোমার ভাগ্নে বলে, তুমি এসব কী বলছ?

গতকাল সিনেমা দেখতে যেতে বলেছিলে?

মাথা ঝাঁকায় শোভন, বলে, বউদিই তো আমায় বলেছিল 'কলঙ্কিনী রাই' দেখবে, আমি যেতে পারিনি ভবতোষদা এল না বলে...। এক নাগাড়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলে যেতেই থাকে শোভন। ক্রমাগত সব অস্বীকার করতে থাকে। বলে, মেসেজ নিয়ে আসুক উনি, আমিও দেখাব, মুখ বাদ দেয়া পিকচার আছে।

মিথ্যে কথা বলো না। অনুপম রাগে কাঁপছিলেন।

হান্ডেড পারসেন্ট ট্রুথ মামা, ওর মেসেজ দেখবে, মামা ও যে রাতে ফোন করে, একটা দেড়টার সময়...।

হতবাক হয়ে বসে আছেন অনুপম। অভিযোগ অস্বীকার করে শোভন বলছে, মেসেজ দেখাবে, দরকারে কাউন্সিলরকে দেখাবে। অনুপম বুঝতে পারছিলেন শোভন একটা ঘোঁট পাকাতে চাইছে। এবং তা তন্দ্রিমার পক্ষে ভালো হবে না। অন্যের মেসেজ তন্দ্রিমার বলে চালাবে। সমাজ এমন যে আদি রসের গন্ধ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। শোভনের সঙ্গে কাউন্সিলরের ভাব হয়ে গেছে নাকি! তিনি চুপ করে গেলেন। শোভন বলল, তুমি কিছু মনে কোরো না মামা, মা বলে তোমার মতো ভালোমানুষ হয় না, তোমার একটা ক্যারেক্টার আছে, ওই মেয়েছেলেটা একদিন তোমাকেও ফাঁসাবে, আমার কি মেয়ের অভাব যে ওই বুড়ির দিকে হাত বাড়াব?

গা ঘিনঘিন করে উঠল। অনুপম হাত তুলে থামালেন। সহ্য হচ্ছে না। শোভনও আন্দাজ করে থেমে গেল। বিকেলে সে বেরোল। অনুপমের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তিনি চুপ করে বসে থাকলেন ব্যালকনিতে। সন্ধের সময় সুমির ফোন, ও বাবলুদা, কী হয়েছে গো?

বিরক্ত লাগল, তবু বিরক্তি চেপে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোর ছেলের এগজাম কবে?

ধর্না ভেঙে দিয়েছে, এবার হবে, হ্যাঁ, বাবলুদা, তুমি কদিন এখেনে আমার কাছে এসে থাকো না গো।

কেন? অনুপম বললেন, আমি ওখেনে গিয়ে কী করব?

কী আর করবে, এখেনে কী ভালো ওয়েদার, বৃষ্টি হলে গায়ে চাপা দিতে হয়, আমার ছেলে কলকাতায় থাকুক, তুমি আমার কাছে এসো, ভালো লাগবে, তোমাকে প্রাণভরে সেবা করতে পারব বাবলুদা, বাড়িতে তুমি আর আমি শুধু।

সম্ভব না। তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন, তোর কি বয়স হয়নি সুমি?

না হয়নি, তুমি আসবে, আসবে, তোমার ফ্ল্যাট পাহারা দেবে আমার ছেলে,আর তুমি বাবলুদা আসবে আমার কাছে, ভালো মন্দ রেঁধে খাওয়াব তোমাকে, আমার কতদিনের সাধ আমার বাবলুদাকে রেঁধে খাওয়াই, ও বাবলুদা, বাবলুদা...বাবলু। চাপা গলায় ফিসফিস করল সুমি। বিরক্ত অনুপম বললেন, তোর ছেলে শোভন কোন দিন কিছু ঘটিয়ে দেবে, কেমন মানুষ করেছিস?

ওরটা ও বুঝবে, বড় হয়েছে, পার্টি ওকে শেল্টার দেয়, এখন ও আসবে না এদিকে, তুমি আমার কাছে এসো বাবলুদা।

কেন যাবে না ওদিকে? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, কী করে এসেছে?

কিছু না, কিন্তু আমিই বারণ করে দিয়েছি ফিরতে, বাদ দাও।

সুমির ফোন একসময় থামল। অনুপমের মনে হল, সুমি কিছু গোপন করে গেল। শোভন তার শহরে কিছু অপরাধ করে কলকাতা চলে এসেছে, এমন হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। কিন্তু কদিন এই শহরে এসে যা করছে তাতে নিজের শহরে যে গোলমাল করে পালায়নি সে কথা কে বলবে? রাতে শোভন ফিরে বলল, দুদিন সে বর্ধমান যাবে, বিনয়জেঠু বলেছে যেতে, বর্ধমানে তার মামার বাড়ি। দুদিন বাদেই ফিরবে। অনুপমের মনে হল, গা ঢাকা দিতেই যেন বর্ধমান যাচ্ছে শোভন। স্পটে না থাকলেও জড়িয়ে যেতে পারে। সে তো মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরিচ গিয়েছিল। যে মেয়েটার মাথায় লাঠি পড়েছিল সে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝছে। যদি কিছু হয়ে যায়, ওর ফ্যামিলি ছাড়বে না। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, যাক। ও যেমন তাড়া খেয়ে নিজের জেলা থেকে কলকাতা এসেছে, তেমনি যেন তাড়া খেয়ে আর যেন কলকাতায় না ঢুকতে পারে। শোভন পরদিন সকালে বর্ধমান চলে গেল। তিনি যেন শ্বাস নিতে পারলেন।

বেলা দশটা নাগাদ ভবতোষ এল খোঁজ করতে। মানে ভবতোষও জানে না শোভন পালাচ্ছে শহর থেকে। অনুপম বসালেন ভবতোষকে, জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ওকে মেটিয়াবুরুজ নিয়ে গেছিলেন?

ভবতোষ বলল, হ্যাঁ স্যার, আপনার ভাগ্নে।

আমি বলেছিলাম মেটিয়াবুরুজের গুন্ডা খুঁজতে, পুলিস তো

এবার গুন্ডাকে ধরবে, নুরুল আর জ্যোতি।
কী হয়েছে, ওরা টাকা নিয়ে কাজ করেছে, কলকাতায় কি আছে?
আপনার বিপদ, শোভন কি মেটিয়াবুরুজ চিনত, গুন্ডারা ধরা পড়লেই বলে দেবে কারা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।
ভবতোষের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, ভয়ের ভাব জেগে উঠল, বলল, আমি কী করব, আমার কী স্বার্থ?
টাকা পেয়েছেন তো?
না, মানে স্যার...। ভবতোষের গলা জড়িয়ে গেল। সে আচমকা উঠে দাঁড়ায়, এর মানে কী স্যার, আমার সারাদিন বাইরে থাকতে হয় স্যার, তাই আমি আপনার ভাগ্নেকে নিয়ে গিয়েছিলাম মেটিয়াবুরুজে, শোভন কলকাতা ছেড়েছে, এখন ফোন বন্ধ রেখেছে, আমি তো এর সঙ্গে জড়িত নই।
অনুপম বললেন, পুলিস যদি এই ফ্ল্যাটে আসে, আমি বলব আপনি সব জানেন।
আমি কিছুই জানি না স্যার, এইভাবে মারবে ভাবিনি, কাল সন্ধেয় কথা হল শোভনের সঙ্গে, সে কিছুই বলল না...। কথা খুঁজে পাচ্ছিল না ভবতোষ। উঠে পড়েও আবার বসল, বলল, আমি কী করব স্যার, আমি তো কিছুই জানি না।
অনুপম বললেন, আপনার বন্ধু শোভন বলতে পারবে।
আপনার ভাগ্নে তো। ভবতোষ পাল্টা বলল চাপ দিতে।
দুর মশায়, আমার কোনও বোন নেই, ওকে জোর করে আপনি আমার ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, আমাকে ওর মা বলেছিল, কিন্তু আমি না করে দিয়েছিলাম...।
ভবতোষ হতভম্ব হয়ে বসে থাকল। বসেই থাকল। তিনি কথা বন্ধ করলেন। ভবতোষ অনেকক্ষণ পরে চলে গেল। অনুপম এর ভিতরে একবার শোভনের মোবাইলে ফোন করলেন, কিন্তু ফোন বন্ধ। ফোন বন্ধ মানে আত্মগোপন করেছে শোভন। গতকালের ঘটনার জন্যই তা। টিভিতে আজও দেখাচ্ছে তা। কী ভয়ানক আক্রোশে লেঠেলরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সহ্য করা যায় না। চতুর্দিকে নিন্দার ঝড় উঠেছে। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। থানার ওসি বদলি হয়ে গেছে এক দিনেই। পরের দিন সন্ধ্যায় চিনি ফোন করল, কাকু, আমার খুব বিপদ।
অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, পুলিসে যাওনি?
কাকু আমি নাকি তান্ত্রিক, আমি আমার মা বাবাকে মেরেছি, আমি কী করব?
যেতে বলছ আমাকে?
আপনি এলে আপনার নামে বলবে, পাল দাদা এসেছিল, পাশের ফ্ল্যাটের কাকিমা বলেছে পালের সঙ্গে আমার খারাপ সম্পর্ক আছে..., বলতে পারছি না কাকু।
আমি কী করতে পারি? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, থানা, কাউন্সিলারের কাছে যাও!

॥ পনেরো ॥

আমি অন্য জায়গায় চলে যাব কাকু। চিনি বলল।
চলে যাবে, কেন থাকা যাচ্ছে না? অনুপম জিজ্ঞেস করলেন।
এমন রটিয়েছে যে কেউ আমার সঙ্গে প্রায় কথা বলে না, আমি কী করে থাকব কাকু?
কিন্তু কথা বলে না কেন?
আমি নাকি উইচ, তন্ত্র সাধনা করি, আমি পুরুষ লোককে প্রলোভিত করি, মা বাবাকে আমিই মেরেছি জাদু করে, জনে জনে সব রটিয়ে আমাকে এক ঘরে করে দিয়েছে, আমি কী করেছি বলুন, আবাসনের দোকান জিনিস দেয় না, আমি কী করব কাকু? চিনি বলল, আমি আমার মাসির বাড়ি চলে যাচ্ছি, ওদিকে একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনব, কলকাতা শহরে এমন হতে পারে?
অনুপম মনে মনে বললেন, তুমি তো বিশ্বাস করো তোমার ঠাকুরের প্রয়াণ হয়নি, অথচ তাঁকে দাহ করা হয়েছিল রীতিমতো, তার ছবি বেরিয়েছিল সংবাদপত্রে, তুমি বিশ্বাস করো না যে তাঁর মৃত্যু হতে পারে।
না, তাঁর মৃত্যু হতে পারে না। চিনি বলল, তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী।
তাহলে এই সব কথা তৈরি হতে পারে, মৃত্যুকে গৌতম বুদ্ধও জয় করতে পারেননি, কুশীনগরে শালবনে তাঁর প্রয়াণ হয়েছিল, জানো তা?
আমার গুরুর মৃত্যু হয়নি, সব রটনা।
দেখো একটা কথা থেকে যেমন আর একটা কথা জন্মায়, এক বিশ্বাস থেকে আর এক বিশ্বাস, এক অন্ধতা থেকে আর এক অন্ধতা, এক অন্ধই আর এক অন্ধকারে ডুবে যায়, তুমি বুঝতে পারছ তুমিই তো অলৌকিকতায় বিশ্বাস করো।
এইটা মেনে নিতে হবে তাই?
কোনওটাই মানতে হবে না। অনুপম বললেন।
কিন্তু কাকু আমার ঠাকুর ভগবান, অবতার, তিনিই কৃষ্ণ...।
চিনি অনেক সময় ফোন ছেড়ে দিয়েছে। ভয়ানক বিশ্বাস তার। বছরে একবার ঠাকুরের জন্মোৎসব করে। অনেককে নিমন্ত্রণ করে। যারা ভূরিভোজ খেয়ে আসে তারাই নানা খুঁত ধরে। তারা কেউ ওর সঙ্গে থানায় যায়নি যে তা নয়, কিন্তু থানার অফিসারের সঙ্গে এক মত যে একটি মেয়ের একা থাকা উচিত নয়। বিয়ে না করলেও তার একজন পুরুষ গার্জেন থাকা উচিত। তার জন্য আত্মীয়-স্বজনের নিকটে যাওয়া উচিত। একা থাকলে নানা কথা জন্মাতে পারে। তা সত্য কি অসত্য সে বিচার করবে কে? গ্রামে তো এমন হয়। পরে দেখা গেছে ঘটনা সত্যি। মেয়েদের ভিতরে এক একজনের ডাকিনীর ক্ষমতা থাকতে পারে। অনুপম থানায় যাননি। সমস্তটাই জট পাকানো। থানা অফিসার বলেছে, মানুষ কী ভাববে, কী বলবে, তা নিয়ে থানার কোনও মাথাব্যথা নেই। থানা দেখবে আইনশৃঙ্খলা ঠিক আছে কি না। কারও কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না।
শোভন নেই। তিনি নিশ্চিন্ত। দিন সাত কোনও সাড়া নেই শোভনের। রাস্তায় এক বিকেলে ভবতোষের সঙ্গে দেখা। সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনার ভাগ্নের খবর পেয়েছেন স্যার?
না তো, আর ও আমার ভাগ্নে নয়।
ভবতোষ বলল, ফোন করেছিল স্যার, ফিরে আসবে, ওর নাম নেই পুলিসের তদন্তে।
নতুন খবরের পিছনে চলে গেছে ধর্না ভাঙার খবর। খবর বাসী হয়ে হারিয়ে যায়, তাই গেছে। এর ভিতরে দুটি ধর্ষণ, হাসপাতালের অবহেলায় শিশুমৃত্যু, বাস দুর্ঘটনায় নব দম্পতির মৃত্যু কত হৃদয়বিদারক ঘটনা যে ঘটে গেছে। মানুষের স্মৃতি দুর্বল। নতুন কথা এসে পুরনো কথাকে ঢেকে দেয়। ভবতোষের কথা শুনে চিন্তিত হলেন অনুপম। আবার ফিরে আসবে? এর ভিতরে অবন এসেছিল। অবন নিশ্চয় শুনেছে তন্দ্রিমার কাছে কিছুটা। আবার যদি ফিরে আসে শোভন, তা খারাপ হবে। শোভন সেই বর্ধমান থেকে তন্দ্রিমাকে মেসেজ করছে কি না জানেন না অনুপম। খুব সাহস ওর। মায়ের মতো বেপরোয়া। অনুপম উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি চাইছেন না সে এখানে ফিরুক। ভবতোষকে বললেন, ওকে জায়গা দেখে নিতে বলবেন।
কী যে বলেন স্যার, ওর কত জায়গায় জানাশোনা, ও অনেক বড় হবে, এবার ও টিকিট পাবে ওর টাউনে কাউন্সিলর ইলেকশনে, পলিটিক্স করছে, দেখবেন ও একদিন মন্ত্রী হবে।
তিনি ফ্ল্যাটে ফিরলেন সন্ধ্যার পরে। বিব্রত বোধ করছিলেন। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তখন ফোন এল তন্দ্রিমার। নিজের ফ্ল্যাট থেকেই ফোন করছে। আঙ্কেল ফ্ল্যাটে আছেন?
আছি তো, কী হয়েছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন।
ওই ছেলেটা আবার মেসেজ করেছে আমাকে, ও কি আসছে?

অনুপম বিব্রত হলেন। বললেন, আমি দেখছি কী করা যায়, অবন জানে?

পুরোটা বলতে পারিনি আঙ্কেল, ভয় করছে, ও এমন ভাবে বলছে যেন আমিই ওকে প্রলুব্ধ করেছি, খুব মিথ্যেবাদী, নোংরা মনের ছেলে।

তুমি ভয় পেয়ো না, আমি দেখছি।

বলছে কোন মন্ত্রী ওর চেনা, তাঁর বাড়িতেই আছে, কলকাতায় আসছে আবার।

অনুপম বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন। সেদিন অনেক রাত অবধি ঘুম আসছিল না। সুমির ছেলে আবার এসে উঠবে এখানে। মেসেজ পাঠাবে তন্দ্রিমাকে। এই বিল্ডিংয়ে দুটি ফ্ল্যাটে মানুষ আছে। শোভনের ভিতর আগ্রাসী মনোভাব আছে। ভয়ডর কম। ভদ্রতা শালীনতা বোধ কম। পড়াশোনা কম। কিন্তু তা স্বীকার করে না। যে কোনও ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। তার জন্যই ওর রাজনীতি। রাজনৈতিক আদর্শবোধ কী তা ও জানে না। ও আবার আসছে। অনেক রাতে ঘুমের ভিতরে আবার ফিরে এল সুমি। সেই আমবাগান আর জ্যোৎস্না রাত। আকাশে চৈত্র পূর্ণিমার চাঁদ। বাবা সংসার সাজিয়ে নিচ্ছেন এপারে। খুব খাটতে পারতেন। মাস্টারি করতেন। কিন্তু তার মাইনে সামান্য। তবু মুখে সব সময় হাসি। ছাত্র পড়াতেন সাইকেলে ঘুরে ঘুরে। আহা, তার ভিতরই জ্যোৎস্না রাতে ছেলে মেয়েদের নামিয়ে দিতেন উঠোনে। যা খেল। এমন চাঁদের আলো! সুমির চুলে খোপা। সুমি তার হাত ধরেছে, বাবলুদা আমার ভয় করছে...।

ভয় করছে তো এলি কেন এখানে?

কথাগুলো বলতে।

কী কথা?

আমার ছেলে বাবলুদা, ওকে তোমার কাছে দিয়েছি, তুমি ওকে আগলে রেখো। বলতে বলতে সুমি তাঁকে আঁকড়ে ধরে। বাবলুদা প্লিজ! ওর বাবা পারেনি, দুঃখে চলে গেছে, আমি জানতাম তুমি পারবে, নিরীহ বাবাকে ও রেয়াত করত না, বলত তার বাবা কোনও পুরুষমানুষ না, মিন মিন করে। বাবলুদা আমার কথা রাখো, প্লিজ, ওকে ভালো করে দাও।

কেমন করে মানুষ করেছিস ওকে?

বাবলুদা তুমি ওকে দেখো প্লিজ, ওর বাবা পারেনি, তুমি পারবে।

স্বপ্নটা অনেক সময় ধরে তাঁকে ঘিরে রয়েছে। সমস্ত রাত ধরে সেই বাগানে, ছায়ার ভিতরে, পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় অন্ধকারে ঘুরছে যেন অনুপম আর সুমিত্রা। ফিসফিস করছে সুমি, বাবলুদা বাবলুদা ছেলের জন্য আমার খুব ভয় করছে, তুমি আমাকে ধরে থাকো।

অনুপমকে দুহাতে যেন পিষ্ট করে ফেলছে সুমিত্রা। ছাড় ছাড়, ছেড়ে দে সুমি। অনুপম আর্তনাদ করে উঠলেন। তিনি যেন চাপা পড়ে যাচ্ছেন আচমকা ভেঙে পড়া গাছের নীচে। ভেঙে পড়া উড়াল পুলের নীচে। পুরনো দালানের নীচে। পাঁজর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সুমি তাঁকে ছাড়ছে না তবুও। দম আটকে আসছে তাঁর। বিড়বিড় করছে সুমি, আমার পায়ে ব্যথা, হাঁটতে গেলে দম আটকে যায়, ভয় করছে খুব বাবলুদা, ছেলে শোনে না, এই শহরে ঢুকতে পারছে না...।

সুমির অজগর-বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে বারবার আটকা পড়ে যাচ্ছেন তিনি। হাঁ মুখে গিলে খাবে যেন সুমি। অজগর ভয়ের ভিতরে ঘুম ভেঙে গেল অনুপমের। ঘুম ভাঙার পর বহুক্ষণ অনুপম চুপচাপ শুয়ে ছিলেন। মনে হচ্ছিল গ্রামের বাড়ি যান। সেই আম আর পেয়ারার বাগান, অবারিত মাঠ, যেতে হবে এখন। সেই বসিরহাট ছাড়িয়ে দাঁড়ের মাঠ। ইছামতী পার হয়ে। কাটিয়াহাট। তার কাছে দাঁড়ের মাঠ। ওখান থেকে ঘোজাডাঙা বর্ডার খুব কাছে। সুমির ছেলে আসবে আজ অথবা কাল। সুমি আবার মাঝেমধ্যে ফোন করবে। এরপর হয়তো চলেই আসবে কলকাতায়। খুব সাহসী নারী। ছেলে তেমনি হয়েছে। স্বামীকে সুমি খুব ভুগিয়েছে নিশ্চয়। ছেলে তা দেখতে দেখতে বড় হয়েছে। তিনি সকালটা ভয়ে ভয়ে থেকে দুপুরে রওনা হলেন দাঁড়ের মাঠের দিকে। দরজায় তালা। শোভন এসে ঢুকতে পারবে না।

অনুপম দমদম জংশন স্টেশনে গেলেন রিকশয়। জংশন থেকে হাসনাবাদ লোকাল। অনেকদিন এই পথে যাননি। টুটুল বিদেশ যাওয়ার আগে তাকে নিয়ে গাড়ি করে গ্রামে গিয়েছিলেন অনুপম। কুন্তলাও ছিল। ভোরে বেরিয়েছিলেন। সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারির শেষ কিংবা মার্চের প্রথম। সমস্ত রাস্তা ছিল আমের বৌলের গন্ধে ভুরভুরে। আহা, মনে পড়ে গেল তাঁর। সে যেন ছিল জীবনের সুখের সুবাস। সেই স্মৃতি সুরভিত পথ। ছেলে বিদেশ যাবে, মেয়ে জামাই এসেছিল দিল্লি থেকে। মনে আছে টাটা বোলেরো ভাড়া নিয়েছিলেন একটি। তখন টুটুলের বিয়ে হয়নি। মা খুব খুশি হয়েছিলেন। সারাদিন থেকে সন্ধেয় ফেরা। মা কিছুতেই আসবে না কলকাতায়। কুন্তলার মৃত্যুতে মা খুব কষ্ট পেয়েছে। কুন্তলা তার শাশুড়ি মায়ের ভালোবাসা পেয়েছিল যদিও শাশুড়ি গ্রাম ছেড়ে তার কাছে এসে দীর্ঘদিন থাকেননি কখনও। দুপুরের ট্রেনে ভিড় তেমন নেই। জানালার ধারে বসেছিলেন তিনি। বারাসাত ছাড়ার পর অবারিত মাঠ, মাছের ভেড়ি, নারকেল, আম, জাম, অশ্বত্থ, বট। ট্রেন ভর্তি হকার। কাঁচাগোল্লা সন্দেশ থেকে ফল, বিস্কুট, রুমাল, গামছা, শাড়ি, সব হেঁকে বেড়াচ্ছে হকার। ঝলমল করছে মানুষের মুখ। তিনি ভাবছিলেন ক'দিন থাকবেন। তাড়াতাড়ি ফিরবেন কি ফিরবেন না? সুমির ছেলে আসবে বলেই কি ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে বেরন? কিন্তু সে তো আজ বা কাল আসছে না। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছিল সে এসে যাবে দু-একদিনের ভিতর।

তাঁর ছোটভাই বিশ্বনাথ প্রাইমারি টিচার ছিল, আর একটা কাপড়ের দোকান করেছিল হাটে। খুব বিষয়ী ছিল সে। বাড়ি পাকা করেছে। বাস্তু ভিটে আর জমিতে নিজের অংশ আছে অনুপমের, কিন্তু তা ছোটভাইয়ের অধিকারেই ছিল। এখন তার বউয়ের। বসিরহাটের মেজভাই তার অংশ বিক্রি করে দিয়েছে। ওপার থেকে আসা একটি পরিবার কিনেছে। বাস্তু ভিটে অবশ্য বেচতে পারেনি। অংশ রেখে দিয়েছে। বাইরের মানুষ তো তাদের ভিটেবাড়িতে এসে বাস করতে পারে না। ছোটভাই কিনবে কিনবে করে কঠিন অসুখে পড়ে গেল। মারা গেছে বছর দেড়। শীতকাল ছিল। দাহ শেষে শীতের রাতে বিশ্বনাথের দুই ছেলে ইছামতী থেকে স্নান করে উঠল। কাঁপছিল হুহু করে। মনে পড়ল তাঁর। বিশ্বনাথের বাৎসরিক কাজ গেল। তিনি আসেননি। কিছু টাকা তপতীর অ্যাকাউন্টে দিয়েছিলেন। মায়ের জন্য একটা টাকা তাঁকে প্রতি মাসে ফেলতে হয়। বিশ্বনাথের কথা মনে পড়ল। ছোটভাই তো। তার বউ তপতী বলেছিল, ভিটেতে মেজদার অংশ কিনে নিতে চেষ্টা করবে। এর ভিতরে কি কিনতে পেরেছে? কিনলে তিনি জানতেন। অনুপম বসিরহাট স্টেশনে নামলেন তখন সাড়ে তিনটের মতো। কাজের শহর গমগম করছে বটে কিন্তু সে তো কোর্ট আর সরকারি অফিস চত্বরে। বসিরহাটের কোথায় মেজভাই নিরুপম থাকে তিনি ঠিক জানেন না। গৃহপ্রবেশে যেতে বলেছিল, তিনি তখন হলদিয়া টাউনশিপে। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে ওদিকে গোলমাল আরম্ভ হয়েছে সবে। ছুটি পাননি। স্টেশন সংলগ্ন মিষ্টির দোকান থেকে কাঁচাগোল্লা সন্দেশ এক কেজি কিনে অনুপম টোটো ভাড়া করলেন। বর্ডার যাচ্ছে কয়েকটি পরিবার। ঘোজাডাঙা পার হয়ে বাংলাদেশ যাবে। সাতক্ষীরে। তাঁদের পূর্ব পুরুষের দেশ। তাদের ভিতরে একটি হিন্দু পরিবার। স্ত্রীলোকের হাতে শাঁখা সিঁথিতে সিঁদুর দেখে বোঝা গেল। গা শিরশির করে উঠল। টোটো

চলছে। টোটো এক অদ্ভুত গাড়ি, টোটো কোম্পানির মতো শহরময় ঘুরেই বেড়ায়। শহর থেকে দূরে যেতে হবে তাঁকে। সেই ইছামতীর সেতু পার হয়ে ক্রমশ সীমান্তের দিকে। সত্তরের দিকে অগ্রসরমান অনুপম এক অদ্ভুত শিহরন অনুভব করছেন। টুটুল বছর নয় গেছে ইউএস। তাকে নিয়ে আসার পর ছোটভাই বিশ্বনাথ মারা গেলে এসেছিলেন। ছোটভাইয়ের কাজে আসা তো ভয়ানক অভিজ্ঞতা। কদিন থাকতে হয়েছিল মায়ের জন্য। আচ্ছা, তার নাম কেন বিশ্বনাথ দিয়েছিলেন বাবা, তা জানেন না অনুপম। অনুপম, নিরুপম, মিলিয়ে নাম খুঁজে পাননি বাবা। আসলে বড়, মেজ, দুজনের নাম রেখেছিলেন বাবার মাস্টারমশায় রাখালবাবু। বিশুর জন্মের সময় রাখাল মাস্টারমশাই বেঁচে নেই। ওপার থেকে এসে বসিরহাটের পাশে শাঁকচুড়োয় আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। ছাত্র পড়িয়ে দিন গুজরান করতেন। মাঝে মাঝে দাঁড়ের মাঠে আসতেন পুরনো ঝরঝরে একটি সাইকেল চালিয়ে। সাইকেলটি এপারে আনতে পেরেছিলেন। এসে ছাত্রের সঙ্গে সন্ধেবেলায় গল্প করতেন ওপারের। স্বাধীনতা আর দেশভাগের জন্য আপশোস করতেন। বলতেন এমন অবস্থা থাকতে পারে না। দেশ কি জমি-জিরেত যে ভাগ হয়ে যাবে? গান্ধী নেহরুর মুণ্ডপাত করতেন, নেতাজি সুভাষের জন্য হা-হুতাশ করতেন। সুভাষ ফিরে এলেই দেশ আবার জোড়া লেগে যাবে এই প্রত্যয় ছিল তাঁর। ছেলেবেলায় একদম ভালো লাগত না মানুষটিকে। একজন মাঝে মাঝে আসেন, খালি হাতে। একটা কদমা, কিংবা বিস্কুটও হাতে করে আনেননি কোনওদিন। পরে শুনেছিল মায়ের কাছে, উনি খুব দুঃখী মানুষ। মেয়ে বিয়ে করেছে ওদেশেরই এক মুসলমান যুবককে। ছেলে তিন জন। তারা এপারে এসে ছড়িয়ে গেছে নানা দিকে। বাপ-মাকে কেউ দেখে না। শেষের দিকে আপশোস করতেন ওপারে থেকে গেলেই হতো। জামাই মানে তাঁর ছাত্র মনিরুল থাকতে বলেছিল। তিনি লজ্জায় আর সংস্কারে আর থাকেননি। পরে মনে হয়েছিল, দেশই যদি ভাগ হতে পারে, তবে মেয়ে শেফালি মুসলমান হলে কী আর হয়েছিল। অবস্থাপন্ন ঘর তাদের। যুগীপোতায় বিঘের পর বিঘে জমি। রাখাল মাস্টারমশাই বাংলাদেশ দেখে যাননি। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, তারপর খাদ্য আন্দোলন, সেই অভাবের দিনেই নাকি আসা বন্ধ করেছিলেন। বাবা একবার শাঁকচুড়ো যাবেন ভেবেছিলেন, খুব দূরে তো নয়, কিন্তু সময় করে উঠতে পারেননি। এখন মনে হয় বাবা যাননি, ভেবেছিলেন মাস্টারমশায়ের অভাবের সংসার মানে গুরু মা এবং গুরুকে নিয়ে আসতে হবে দাঁড়ের মাঠে। সেই ভয়েই বাবা যাননি। মাস্টারমশায় বেঁচে আছেন না মরে গেছেন, তা জানতেন না বাবা। দায়িত্বের ভয়ে জানার চেষ্টা করেননি। প্রবীণ মানুষটিকে বাড়ির কেউই খুব পছন্দ করত না। কেউ না। সুমিও না। টোটো দাঁড়িয়ে পড়েছিল। টোটোর সামনে মালবাহী এক অতিকায় ট্রাক। তার সমুখে এসে পড়েছে একটি প্রাইভেট কার। তাঁর টোটোর ডান দিক দিয়ে সাইকেল, মোটর সাইকেলের সারি। তারা ওদিক থেকে এদিকে আসছে। বসিরহাট যাবে। চমকে ওঠে অনুপম। রাখালবাবু না! অপরাহ্ণ বেলায় ঝরঝরে র‍্যালে সাইকেল ঠেলে বাড়ি ফিরছেন দাঁড়ের মাঠ থেকে। সেই সময় খেয়া পার হয়ে আসতেন সাইকেল নিয়ে। এই সেতু হয়েছে পরে। তিনি ডাকলেন, স্যার, মাস্টার দাদু।

॥ ষোলো ॥

রাখালবাবু চোখ তুলে দেখলেন। তারপর মাথা নামিয়ে নিলেন। দাঁড়ানোর কোনও উপায় নেই। পিছনের মোটর সাইকেলওয়ালা তাড়া দিচ্ছে। খুব জোরে তার হর্ন বেজে উঠল। রাখালবাবু। একেবারেই সেই বুড়ো লোকটি। সেই পপলিন কাপড়ের ময়লা সাদা শার্ট। ধুতি। ঘামে মুখখানি ভিজে ভিজে। অনুপম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন পেছনে। তিনি সামনে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে এক মুহূর্তের জন্য পেছনে ফিরলেন। কী বিস্ময় তাঁর চোখে। টোটো এগিয়ে গেল। ধীরে ধীরে জট কাটল। তাঁকে নিয়ে টোটো ছুটতে লাগল। টোটোর ভিতরে গান বাজছে, ঠান্ডি হাওয়াঁয়ে লেহরাতি আয়ে..., কত কাল আগের গান। কী সিনেমা? নও জওয়ান, লতা মুঙ্গেশকরের গান, খুব গাইত সুমি। সুমি। বেলা পড়ে আসছে। রেখে যাচ্ছে সেই গান। সুমি ওই গান পেল কী করে? গানটি ১৯৫০-৫১-র। ইউটিউবে শুনেছেন অনুপম। সুমি তাঁর চেয়ে বছর ছয়-সাত ছোট ছিল। এই গানের কথা কবি শাহির লুধিয়ানির, শচীন দেববর্মণের সুর। কোমর নামানো লম্বা ঝুলের ফ্রক, মাথা ভর্তি চুল, চুল খুলে দিলে পায়ের গোড়ালি ছুঁয়ে যেত। সুমি বলেছিল রেডিওয় শুনেছে। তখন রেডিও কোথায় ছিল? সুমি বলেছিল তাদের তালা গ্রামে পাশের বাড়ির মান্নান সাহেবের বাড়িতে ছিল মস্ত রেডিও। রেডিওতে ইন্ডিয়া শোনা যেত খুব ভালো। মান্নান স্যার ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিল। তার ছেলে মহসিন ঢাকায় গিয়েছিল সিনেমা করতে। সুমিকে সিনেমায় নামাবে বলেছিল। মহসিন তার দিকে নজর দিয়েছে, সেই ভয়ে তাকে এপারে পাঠিয়ে দিল। মহসিন এতদিনে হয়তো হিরো হয়ে গেছে। অবাক হয়ে সুমির কথা শুনত অনুপম। সুমি বলত, পাকিস্তানে থাকলে সে হিরোইন হয়ে যেতই। মহসিন বলেছিল করাচি নিয়ে গিয়ে উর্দু সিনেমায় নামিয়ে দেবে সুমিকে। খুব দাম হবে হিন্দু হিরোইনের।

এই গান কি সিডিতে বাজছে? জিজ্ঞেস করলেন অনুপম।

ইয়েস স্যার, বন্ধ করে দেব? বেস্ট অফ লতা মুঙ্গেশকর। টোটো ড্রাইভার বলল।

না না, বন্ধ করবে কেন? অনুপম বললেন।

কেউ কেউ স্যার শুনতে চায় না। টোটো ড্রাইভার বলল, তখন বন্ধ করে দিতে হয়।

আস্তে বাজাবে, তাহলে ভালো লাগে, এইটা ১৯৫১ সালের গান।

জানি স্যার, সবই আগের জন্মের, রহে না রহে না হাম......এই গানটা, সুচিত্রা সেন অশোককুমার, ধর্মেন্দ্র, আমার দারুণ লাগছে, শুধু শুনছি।

কথা বলছিল তরুণ টোটো ড্রাইভার গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে দিয়ে। ধীরে ধীরে চলছিল গাড়ি। সে বলছিল গতকাল একটা প্যাসেঞ্জার নিয়ে সে বর্ডার থেকে কাটিয়াহাট গিয়েছিল, একটা মেয়ে, একুশ-বাইশ, সিডিটা দিয়ে বলল, ' এইটা চালাও, তুমি শুনো, কেউ শুনতে চাইলে শুনিও, স্যার আমাকে এমনি দিয়ে নেমে গেল কেটে (কাটিয়াহাট) বাজারে।

কেমন দেখতে? অনুপম মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মাজা মাজা গায়ের রং, দেখলে মনে হয় খুব ঠান্ডা ওই মেয়ে, কী সুন্দর, হিরোইনের মতো, মাথায় অনেক চুল।

কত চুল? জিজ্ঞেস করলেন অনুপম।

বলল পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত।

তুমি জিজ্ঞেস করলে?

না স্যার, তিনিই বললেন,তাঁর চুল দেখতে কতজন আসে, সাতক্ষীরেয় অমন চুল কাউর নেই, মনটা কত ভালো বলেন।

হুঁ। চুপ করে থাকলেন অনুপম। গা শিরশির করছে। কাটিয়াহাট গঞ্জ এসে গেল। বেলা এখন নেই-ই প্রায় আর এখান থেকে দাঁড়ের মাঠ তিনি হেঁটে যাবেন। মিনিট কুড়ি লাগবে। সন্ধের আগে বাড়ি।

গঞ্জ এখন চেনা যায় না। মঙ্গল শনি, হাটের দু'দিন জমজম করত কেটে। এখন সব দিন, সমস্ত দিনই সেই অবস্থা। এই হাটে নাকি পার্টিশনের আগে সাতক্ষীরে থেকেও লোক আসত। তাঁর বাবাও এসেছেন পুজোর বাজার করতে। সাতক্ষীরে বসিরহাটের চেয়ে একটু সস্তা ছিল নাকি। পার্টিশনের পরেও আসত ওপারের লোক। বাবা কতদিন বাড়ি ফিরে বলেছে, অমুকের সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞেস করলাম, গ্রামের কথা, কেডা কেমন আছে। অদ্ভুত লাগত। তাহলে তারা চলে এল কেন? কিন্তু আস্তে আস্তে সেই

আসাও বন্ধ হয়ে গেল। তিনি হাঁটতে লাগলেন। কোথা থেকে এক খণ্ড মেঘ এসেছে, বড় একখানি ছায়া তাঁর মাথায়। আহা! যেন তাঁর বাবা জীবনকুমার সেন, ঠাকুরদা সুধীরকুমার সেন ছায়া মেলে আছেন মাথার উপর। ঠাকুরদা বুড়ো হয়েছিলেন। কেটের কাছে দাঁড়ের মাঠ তিনি চিনতেন, এখানে পার্টিশনের আগে কয়েকবার এসেছেন সাইকেলে। দাঁড়ের মাঠ সাতক্ষীরে থেকে আর কতটা! তাঁদের ধারণা ছিল এই পার্টিশন থাকবে না। কিন্তু থেকে গেল। কী সুন্দর ঠান্ডা বাতাস আসছে। জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। সেই প্রান্তর এখন ভরেই গিয়েছে প্রায়, তবু খালি জায়গা অনেক। তিনি দেখলেন সেই বট। কতকালের সেই বট। নিশিদিশি দাঁড়ায়ে আছ মাথায় লয়ে জট। বটের পেছন দিকে হাজরা ঠাকুরের থান। অনুপমের ছোটভাই বিশ্বনাথ জন্মের পর মরেই যাচ্ছিল। হাজরা ঠাকুরের কাছে মানত করে নাকি বাঁচানো হয়েছিল। হাজরা ঠাকুর শিবের অনুচর। হাজরা ঠাকুর বাঁচিয়েছিল বলে, ওর নাম বিশ্বনাথ। আর ডাকনাম বিশু ছাড়াও আর একটি ছিল, হাজু। বিশু বেঁচে থাকতে পারল না। আকাশ থেকে এক দুই ফোঁটা জল পড়ল। অনুপম দূরে, সেই ছায়াময় বটের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বিশুও তাঁকে ছায়া দিয়েছে। দু'ফোটা জল। তিনি আকাশে তাকালেন। দুচোখ ভরে এল জলে। বৃষ্টি আসবে নাকি? আসুক। এই মেঘ ছিল না। কোন পার থেকে যে এল বটের ছায়া নিয়ে!

চৈত্র সংক্রান্তিতে হাজরা ঠাকুরের থানে বড় পুজো পাঠ হয়। কোথা থেকে এক রক্তবস্ত্র পরিহিত পুরোহিত এসে পড়ত যে তা কেউ জানত না। নানা রকম অনুমান করত। যশোর জেলার ঝিনাইদহর কাছে বেগবতী নদীর ধারে কালীগঞ্জের হাজরা ঠাকুরের মন্দিরের সাত পুরোহিত-তান্ত্রিকের একজন সে, তাকে ঠাকুরই ডেকে আনত এপারে। ঠাকুর-দেবতার কি বর্ডার আছে? দিন তিনেক আগে থেকে ধুনি জ্বলত। তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পেঁচোয় ধরেছিল বিশুকে। হাজরা ঠাকুর রক্ষা করেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ওই যে বটের ছায়া আর অন্ধকারে কেউ একজন দাঁড়িয়ে। বিশু, বিশ্বনাথ! বালক দাঁড়িয়ে ওই দূরের ছায়ায়। অনেকদিন বাদে গ্রামে এলেন। বিশুই দেখেছিল বাগানে সুমি আর অনুপমকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায়। তখন সে বছর আট-নয়। তাকে বুলু ময়রার দোকানের চিট-কদমা কিনে দিয়ে তবে রক্ষে। আবার এক ফোঁটা জল। আনন্দের না কান্নার! তিনি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি এলেন। ভেরেন্ডা গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়ি। কত লোক ছিল এক সময়। পরে দুই কাকা চলে গেল কদম্বগাছি আর বারাসত। এখন আর তেমন যোগাযোগ নেই খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে। সেই কলকল শুনতে পেলেন অনুপম। ঝাঁপিয়ে এল যেন সুমি আর বিশু। নিরুপম তেমন ছায়া রেখে যায়নি। বাল্যকাল থেকেই সে আলাদা আলাদা। তিনি স্পষ্ট দেখলেন চুল খুলে উঠনে দাঁড়িয়ে আছে সুমি। ছায়া নেমেছে তাকে ঘিরে। আর ছায়া ঘিরে আছে সবাই। এ কি সত্য, সত্য সকলি সত্য! অনুপম ডেকে উঠলেন, মা।

মা তো বারান্দায় বসে আছে মাদুরে। কে? ডাক দিয়ে যেন মাজা ভাঙা অথর্ব বনতরু মাথা তুলে তাকাল। তাকাল সেই সুমি। বাবলুদা, আরে তুমি, আমি সুমি। বাবলুদা! ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আহা! মোর নয়নের বিজলী উজল আলো! যেন ঈশান কোণের ঝটিকার মতো কালো। এ কি সত্য!

সাতক্ষীরে থেকে রবীন্দ্রনাথের গান শিখে এসেছিলি তুই। তাদের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের গানের চিহ্ন ছিল না। সুমিই নিয়ে এসেছিল। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, বাবলু তুই?

হ্যাঁ, মা, আমি বাবলু।

বড়দা আপনি? ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে তপতী। বিশ্বনাথের বিধবা। দুই ছেলে দুই মেয়ে। এক মেয়ের পর দুই ছেলে, তারপর আর এক মেয়ে। বড় মেয়ে বিয়ে হয়ে বনগাঁ। মেয়ে মায়ের আঁচল ধরে আছে সব সময়। জেঠাকে ভালো চেনে না।

হ্যাঁ, চলে এলাম। অনুপম বসলেন চেয়ারে। কোমর ভারী। মাটিতে বসতে কষ্ট হয়। বললেন, চলে এলাম তপতী, মন টানল, মা।

মা সাড়া দিল, তুইও কি আমেরিকায় চলে যাবি বলে দেখা করতে এইচিস বাবলু, যা তোরা সবাই চলে যা।

কী যে বলো মা! অনুপম মাকে জাপটে ধরলেন আমি ইন্ডিয়া ছেড়ে যাব না।

বিশুর এক ছেলে কাটিয়াহাট বাজারে কাপড়ের দোকান চালায়। দোকান তার বাবার রেখে যাওয়া। বছর চব্বিশ। তার বিয়ে দেবে তপতী। তপতী এখন বছর পঁয়তাল্লিশ। বেশিও হতে পারে। কালো পাড় শাড়ি পরে। সাদা ব্লাউজ। মাথা থেকে কাপড় নামায় না। তপতী বলল, আমার ছোটটার খুব মাথা, ইস্কুলের স্যাররা বলেছিল সায়েন্স নিতে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতাম, কিন্তু আর্টস পড়ছে, আপনি একটু বলবেন দাদা, যেন ইঞ্জিনিয়ার করতে পারি।

ইলেভেন তো?

হ্যাঁ, টিউশন দিতাম ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য, কিন্তু সে জোর করে আর্টসে ঢুকল, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে সেও আমেরিকা চলি যেতি পারত। তপতী বলল লো ভোল্টেজের আলোর ভিতরে দাঁড়িয়ে।

মা বলল, তুই একটু বুঝা, তোর কাছে থেকে না হয় পড়বে।

ছেলেটির নাম অভ্রনীল। অভ্রনীল সেন। তার দাদার নাম অদ্রিনীল সেন। নাম তাঁর দেওয়া। বিশু বলেছিল, দাদা, তুমি ভালো নাম দাও মিলিয়ে মিলিয়ে। বিশু বেশিদূর পড়েনি। ব্যবসায় মন হল। অদ্রিনীল দুপুরে ফেরে না। সারাদিন কেনা বেচা। ফিরতে রাত হয়। অভ্র কৃষ্ণকায়। বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে জেঠাকে দেখছিল। বছর সতেরো হবে। তাঁর তখন এই বয়স। সুমি গুনগুন করছে, মোর মধুর অধর বধূরও নবীন অনুরাগ সম সত্য। চ বাবলুদা পেয়ারা পেড়ে দিবি।

অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, বিজ্ঞান পড়লে না কেন, বিজ্ঞান এক সমুদ্র, তার কিছু পেতে।

আঠেরো বছরের সদ্য যুবক বলল, আমি কবিতা লিখব জ্যাঠামশায়, কবি হব।

কবিতা লিখো, কিন্তু কবিতার সঙ্গে বিজ্ঞানের তো বিরোধ নেই।

অভ্র চুপ করে থাকে।

মোবাইল বাজল, শোভন ডাকল, মামা, ও মামা, আমি ফিরছি।

তিনি ভাবলেন খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চলে এসে। তিনি বললেন, ব্যস্ত।

মামা তোমার জন্য বর্ধমানের সীতাভোগ নিয়ে যাচ্ছি, তুমি নাকি খেতে ভালোবাসো?

তিনি চুপ করে থাকলেন।

মা বলল, তাই নিয়ে যাচ্ছি, ল্যাংচাও নিয়েছি।

ব্যস্ত আছি, বলে তিনি ফোন কেটে দিলেন।

অদ্রিনীল ফিরতে রাত আটটা। তখন চাঁদ উঠে গেছে। তিনি উঠোনে বসে ছিলেন। জ্যোৎস্নায় উঠোন ভেসে যাচ্ছে। কতদূর দেখা যাচ্ছে। অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, আজ কি পূর্ণিমা?

মা বনতরু বললেন, কাল পুন্নিমে, তুই এলি, কাল কি সত্যনারায়ণ দেব?

কেন?

মা বনতরু বললেন, তোদের সকলের জন্য, তোরা দুই ভাই, তোদের ছেলে মেয়ে নাতি, বিশুর ছেলে মেয়ে, সকলের জন্য।

কী মনে হল অনুপমের, বললেন, দাও, ঠাকুরমশায় আছেন কেউ, আগে যে ভটচায্যি মশায় করতেন, তাঁর ছেলেরা কি করে?

সে ব্যবস্থা অদ্রি করবে, বিশু চলে গেল, এক বছর কাল অশৌচ গেল, তারপর মনে হয়নি। বিনবিন করে মা বললেন।

অদ্রি বলল, বলল, ভালো হবে, অনেকদিন সত্যনারান হয়নি।

রাতে ভাত খেয়েছেন অনুপম। শুক্তো, মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, চুনো মাছের চচ্চড়ি, পারশে মাছের মাখো মাখো ব্যঞ্জন। তপতীর রান্নার হাত ভালো। তপতীরা পানিতর গ্রামের। পানিতর বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে, বহু প্রাচীন গ্রাম। পানিতরেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বিবাহ। প্রথম পক্ষ গৌরী ওলাওঠা হয়ে মারা গিয়েছিলেন। তপতী দেখেছে সেই শ্বশুরবাড়ি। পানিতরের মুখুজ্জেরা সুখ্যাত পরিবার। অনুপম অনেকবার ভেবেছেন যাবেন একবার পানিতর। যাওয়া হয়নি। দেখা হয়নি, একটি ধানের শিষে এক বিন্দু শিশির। তিনি বিভূতিভূষণ পড়তে ভালোবাসেন। সীমান্তের ওপারে তাঁদের পূর্বপুরুষের দেশ। খাওয়ার পর বারান্দায় গিয়ে বসলেন অনুপম। মা বসে আছে বারান্দার অন্ধকারে। বাইরে উঠোনে চাঁদের অফুরন্ত আলো। তপতী এসে বসল শাশুড়ি মায়ের পাশে। অভ্রনীল পড়ছিল ভিতরে। বেরিয়ে এসে আচমকা জিজ্ঞেস করেছে, তুমি কাল পানিতর যাবে, বিভূতিভূষণের বাড়ি?

নিয়ে যাবি? তিনি অভ্রর মাথায় হাত রাখলেন।

তখন তপতী জিজ্ঞেস করল, টুটুল কি ওদেশেই থেকে যাবে?

অনুপম দায়সারা উত্তর দিলেন, কিছু বলেনি।

মা অন্ধকার থেকে আবার জিজ্ঞেস করল, তুই কি ওদেশে যাবিনে ওদের দেখতি?

হাসলেন অনুপম। মা এই রাগ করছে সে ওদেশে যাবে বলে। আবার বলছে, সে একবার গিয়ে দেখে আসুক ওরা ওদেশে কেমন আছে। বিদেশ-বিভুঁই তো। কতই বা বয়স তাঁর নাতিটার। সেদেশে নাকি খুব শীত পড়ে। আহা, মা একটা কাঁথা বুনতে পারত যদি, নাতিকে দিত। কিন্তু এখন আর পারে না। তবে আছে একটা, একজনের ওমের মতো, বাবলুর নাতি গায়ে দিয়ে শোবে। সারা বছর শীত। সে দেশে মানুষ থাকে কী করে?

যান দাদা, ঘুরে আসুন, দেখে আসুন, ছেলে বলে বিরাট দেশ, দেখার মতো। তপতী বলল, সকলেই ধনী।

মা তা শুনে উলটো কথা বলল এবার, গেলি তো আর ফেরবে না।

অনুপম বললেন, না বলেননি, কথাটা নিয়ে মনের ভিতরে খেললেন, কে বলেছে তোমাকে এ কথা?

তপতী বলল, কেন ফেরবে না মা।?

মা বলল, কেডা ফিরেছে বলো, আমার নাতি নাত বউ ফিরল?

তপতী চুপ করে থাকে। কী বলবে ঠিক করে উঠতে পারে না।

মা বলে, আমি তো দেখতিছি যে যায় সে ফেরে না, সে নাকি এমন দেশ, ফিরবে কেউ তা ভাবতিই পারে না, জাদুর দেশ, গাছে গাছে হিরে মোতির ফল, সেই যে গল্প আছে না, সেই জাদুতে মজেছে মানুষ।

তুমি যে কত দেখবে মা? মনে মনে বললেন অনুপম, তিনি মায়ের কথায় খুব খুশি হচ্ছিলেন না।

কিছু বলতিছিস? মা জিজ্ঞেস করল।

কিছু না মা। অনুপম বললেন।

সত্যি আমার কত দেখতি হবে, কবে আমি নিজি যাব। মা বিড়বিড় করল।

অনুপমের কী খেয়াল হল, জিজ্ঞেস করলেন, মা, তোমার সইয়ের মেয়ে সুমি ফোন করেছিল।

কার কথা বলতিছিস?

যে সুমি এখেনে ছিল, তার মা তোমার সই ছিল ওর মা, তৃপ্তিমাসি।

সেই মেয়েডা, সেই নচ্ছারডা। মা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। চোখে রাগ ফুটে উঠল। প্রাচীন এবং পুঞ্জীভূত ক্রোধ, সে তোরে ছাড়েনি এখনও, বুঝতি পারতিছি, বউমা ওই জন্যি অকালে চলে গেছে, টুটুলও তাই মনের দুঃখে আমেরিকা চলে গেল, তুই যা, তুই টুটুলের কাছে গে থাক, ও যেন আর খোঁজ না পায় তোর। শয়তানি।

॥ সতেরো ॥

তপতী উঠে গেছে। তার মানে তপতী জানে। মা গল্প করেছে। আবার এমনও হতে পারে বিশুই বলেছিল মায়ের সইয়ের মেয়ে সুমিত্রার সঙ্গে সেই পনেরো ষোলোর বড়দার গল্প। সাক্ষী ছিল সে। সুমি নিরুপমের বয়সি। তখন চোদ্দো। নিরুপম ছিল না বাগানে। অন্ধকারে বসে মা চাপা গলায় গর্জন করল যেন, বলল, বউমারে খেইছে ও, বউমা সারাজীবন কষ্ট পেয়েছে, সুমি সব্বোনাশী, তুই এখনও বুজিসনি, তুই আমেরিকা চলে যা, আমার কিছু হবে না, নিজে বাঁচ।

বিরক্ত হলেন অনুপম, বললেন, কী যে তুমি বলো, সে আমার খোঁজই রাখত না, যোগাযোগ ছিলই না, নর্থ বেঙ্গলে থাকে।

হিংসেয় বাণ মেরেছে দূর থেকে, ওসব মেয়ে অমনি হয়, আমি সব বুজতাম, তারে সাবধানও করিছিলাম, ওইটুকুনি বয়েস, ওর ভিতরেই পুরুষ চিনেছিল, কিছু কিছু মেয়ে এমনি হয়, দেহ না, কয়লার উনুন, গনগন করে জ্বলতেছে সব সময়।

অনুপম চুপ করে থাকলেন। মায়ের রাগ এখনও পড়েনি। সইয়ের মেয়ে। সইয়ের খুব ভয় হয়েছিল। সই তার কাছে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। না পাঠালে মেয়ে অতদিনে সিনেমা করতে ঢাকায় চলে যেত মহসিন না কার সঙ্গে। মুসলমান হয়ে যেত। কিন্তু এখানে এসে যা করছে, সামলানো মুশকিল। পাকিস্তানে আবার পাঠিয়ে দিতে না হয়। মা বলল, রাগ পড়বে কেন, ভয় তো দেখতিছি যায়নি, সে কেন তোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে?

অনুপমের মনে হল বলে, বুড়ো হয়ে গেছি মা, এখন সে আর কী ক্ষতি করতে পারে, ছেলেটো মানুষ হয়নি, কষ্টে আছে।

মা বলল, তোরে নষ্ট করতি এইছিল।

অনুপম বলতে চাইলেন, থাক মা, আমাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল সে।

মা যেন অনুচ্চারিত কথার জবাব দিল, আছরয় নিয়ে যা করতে গেল, ছিহ! যা আমেরিকা চলে যা, আমার কষ্ট হবে না, বিশু চলে গেল, তুইও যাবি, আমেরিকা থেকে যেন না ফিরিস আর।

অনুপম চেয়ার থেকে উঠে মায়ের পাশে গিয়ে বসেন, দুহাতে জড়িয়ে ধরেন, বলেন, কী যে বলো মা, তোমার বউমার যে অসুখ হয়েছিল, তা ধরা যখন পড়ল, কিছু করার ছিল না, আমি একা তাঁকে নিয়ে ছুটোছুটি করেছি।

মা বলল, সে কি আমি জানিনে, বিশুর যাবার উপায় ছিল না, তারেও তো তখন ভিতরে ভিতরে রোগে ধরিছে, সব ওই সব্বোনাশীর জন্যি।

ছি মা, অন্যের মেয়েকে এখনও দোষ দাও কেন, আমারও কি দোষ ছিল না?

আমি তারে বলেছিলাম এ তুই কী করিস সুমি, ফের পাকিস্তানে পাঠায় দেব। সে বলেছিল, তাই দাও, গিয়ে নাকি করাচি চলে যাবে, সিনেমায় নামবে।

অল্প বয়স ছিল, এখন সে অন্যের ঘরের বউ, বয়স হয়ে গেছে, আমার সঙ্গে আর তো দেখা হয়নি।

মা বলল, আমি তারে বললাম, বাবলু তোর দাদার মতন, তার সঙ্গে কী করিস, সে বলল, কিছুই করিনে, বাবলুদারে আমি ভালোবাসি।

আহ মা, ভিতরে ওরা শুনবে।

আমার সই চিনত নিজির মেয়েরে, তারে কম ভুগয়েছে? মা চাপা গলায় বলল, ফোন ধরবিনে, আমার বউমা কেন অকালে সুখের দিনে চলে গেল তা আমি বুজতি পেরিছি এতদিন পরে।

থাক মা, তোমার কোনও ভয় নেই, সে এখন আর কিছু করতে পারবে না।

পারবে পারবে, শুনিছি যেমন মেয়ে, স্বামীও তেমন পেয়েছিল, মার খেত, তারপর তার স্বামীর কথায় তার উপরওয়ালার ঘরে যেতে হতো, ভুটান বেড়াতে গিয়ে স্বামী তাঁকে উপরওয়ালার কাছে রেখে চলে এসেছিল, এসব জানিস তুই?

এসব কথা তোমাকে বলল কে? অনুপম কষ্ট পেলেন শুনতে শুনতে।

সই চিঠি লিখত, দুঃখের কথা লিখত। মা বলল, তার স্বামী খুব ঘুষ খেত, নিজের বউকে সাহেবের বাংলোয় পাঠাত, তাতে তার খুব উন্নতি হয় চাকরিতে, মেয়ে দুঃখের কথা তার মাকে বলেছিল। মা বলল, যেমন চরিত্র তেমন হয়েছে, হয়তো সে নিজেই যেত উপরওয়ালার কাছে, মিথ্যে করে লিখেছিল সই, তাই-ই হবে, তুই যোগাযোগ রাখবিনে।

মা বলল, দেখ বাবলু, খারাপ কথা বাতাস বয়ে আনে, ও সেই উত্তরবঙ্গে থাকুক আর বসিরহাট থাকুক, মুখে মুখে চলে আসে, ছি ছি ছি, এসডিও না কি অফিসার, তার সঙ্গে ভুটান ঘুরতে চলে গেল, ফিরে আবার স্বামীর কাছে, অফিসার নামিয়ে দিয়ে গেল।

সে তো ওর স্বামী রেখে এসেছিল বললে।

ও তো সই লিখেছিল তার মেয়েকে নির্দোষ প্রমাণ করতে, আসল এইটা কিনা জানতে চেয়ে আমি চিঠি দিয়েছিলাম, জবাব পাইনি, সই আর চিঠি দিত না।

অনুপম বললেন, তুমি লিখে ভুল করেছিলে, এমন হয়, লোভী পুরুষ নিজের ওয়াইফকে বসের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

তুই সরে আসতি পেরেছিলি, বেঁচি গিইছিস, ওর স্বামী বউয়ের জন্যই রোগে পড়ল আগে মরে গেল, লোকটার কী কষ্টের জীবন!

অনুপম বলল, থাক মা, ভালো লাগছে না।

লাগবে কী করে, ওই মেয়ের পাল্লায় যে পড়েছে, তার জীবন শেষ, অফিসারকে বিয়েই করতে দেয়নি, টাকা নিত তার কাছ থেকে, বাড়ির উপরতলা তার টাকায় করা।

এসব কথা তোমাকে কে বলেছে? অনুপম ক্ষুব্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

এরকম তো ঘটে, বসিরহাটে ঘটেছিল, আমি শুনেছিলাম।

তাই তুমি ভেবে নিলে...।

তৃপ্তি তো তার মেয়ের পক্ষে কথা বলত।

থাক মা, কাল সত্যনারায়ণ হবে, এখন ওসব কথা না বললেই ভালো, কী সুন্দর জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নায় দাগ লাগছে কালো।

মা চুপ করে গেল। অনুপমের মনে পড়ছিল বাবার কথা। বিকেলে ভটচায্যি মশায় পুজো করলেন। সন্ধেয় আকাশ জুড়ে কাঁসার বগি থালার মতো চাঁদ। বাড়িতে সেদিন রাখালবাবুও এসেছেন। বাবা বললেন, আয় সকলে মিলে লুকোচুরি খেলি, জ্যোৎস্নায় সব নেমে যা উঠোনে।

রাখালবাবু বললেন, জীবন, আমি তো লুকুতি পারব না।

বাবা বললেন, আপনি কি বসে থাকবেন?

জীবন, মেয়েডার কথা খুব মনে পড়ে, থাকলিই পারতাম ওপারে, মেয়ে মুসলমান হয়েছে সেই অপমানে চলি আলাম, এখন ভাবি, হয়েছে হয়েছে, সুখেই তো আছে, ভালোবেসে বিয়ে করেছে ওরা, জামাই বলেছিল ও হিন্দুই থাকবে, পুজো-আচ্চা সব করবে, কিন্তু তা কি হয়, কিন্তু না হলিই বা কী, ভালোভাবে বাঁচাটাই তো আসল কথা।

বাবা বললেন, আসুন জ্যোৎস্নায় নামি, এই তোরা যে যার পারিস লুকো, আমি আর মাস্টারমশায় খুঁজে বের করি।

অনুপম ডুবে গিয়েছিলেন নিজের ভিতরে। তখন তাঁর মোবাইল বাজল। শোভন ডাকছে, মামা, তুমি কোথায় আছ?

কী দরকার?

এখন দশটা বাজে, তুমি ফ্ল্যাটে নেই কেন? শোভন রাগত গলায় জিজ্ঞেস করল।

জানিনে কেন? তিনি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন।

আমি এখন কোথায় যাব? শোভনের গলায় ঝাঁজ।

বাড়ি চলে যাও, রাতে অনেক ট্রেন নর্থ বেঙ্গলের, কতদিন কলকাতায় থাকবে?

কী সব ফালতু কথা বলছ, কলকাতায় আমার অনেক কাজ, তুমি আমাকে না বলে ফ্ল্যাটে চাবি দিয়ে কোথায় বসে আছ? শোভন গরগর করে উঠল।

ফোন কেটে দিলেন অনুপম। শোভন আবার ফোন করল, তুমি এটা ঠিক করছ না, অতবড় ফ্ল্যাট, একা থাকো, আমি একটা ঘরে থাকতে পারব না, আমি হোটেলে যাচ্ছি, কাল সকালে যেন খোলা থাকে ফ্ল্যাট।

তিনি চুপ করে থাকলেন।

আমি টুটুলদাকে হোয়াটস আপ করেছি, মামা তুমি একা থাকবে অতবড় ফ্ল্যাটে, আর আমি রাস্তায় ঘুরব, তা হবে না।

তিনি বললেন, তুমি কেন নিজের শহরে ফিরতে চাও না, কী করে এসেছ?

কে বলেছে এসব কথা, মা?

তিনি বললেন, আমি ব্যস্ত। ফোন কেটে দিলেন আবার।

বিরক্ত অনুপম দেখলেন জ্যোৎস্নায় মেঘের ছায়া পড়ল। বসে থাকলেন চুপচাপ। তখন অদ্রি আর অভ্র, দুই ভাই আর তাদের মা তপতী উঠোনে জ্যোৎস্নার ভিতরে তালপাতার পাটি পেতে বসল, তিনি নেমে এলেন উঠনে। মা বনতরু নেমে এলেন টুরটুর করে, বসলেন নাতি আর ছেলের বিধবা বউয়ের পাশে। অনুপম ঘুরছিলেন উঠোনে, বললেন, আমরা ভাই বোনেরা এখানে বড় হয়েছিলাম, জানো অদ্রি?

অদ্রি বলল, জানি, ঠাকমা সব বলেছে, আমার ভাইয়ের মাথা খুব, ও বড় হবে, দুকান করবে না আমার মতো, কিন্তু কবিতা লিখে কি জীবন চলবে?

দোকান করা খারাপ?

না জ্যাঠাবাবু, কিন্তু জগতের তো কিছুই জানা হয় না, দেখা হয় না, তেল-মশলার হিসেবের বাইরে জগৎ কত বড়!

তপতী বলল, ওর বাবা চলে যাওয়ার পর, এক রাত্তিরেই ও বড় হয়ে গেল, ছেলে আর মেয়েডারে আমি ভালো করে মানুষ করতে চাই দাদা।

মেয়ের বয়স দশ। ক্লাস ফোরে পড়ে। মাকে জড়িয়ে বসে আছে। সারাদিন ড্যাবড্যাবে চোখে দূর থেকে জ্যাঠামশায়কে দেখছে। কথাই বলে না প্রায়। তিনি হাতছানি দিলেন। সে হাসল। এল না। অদ্রি বলল, জেঠাবাবু, আর বছরে, এখেনে খুব গোলমাল হল।

জানি, ফোন করতে চেষ্টা করলাম, বন্ধ ছিল।

অদ্রি বলল, হ্যাঁ, মোবাইল, ইন্টারনেট, সব বন্ধ ছিল।

কিন্তু সে তো হয়েছিল বাদুড়িয়া, বেড়াচাঁপার দিকে।

বসিরহাট বাদ যায়নি। অদ্রিনীল বলল, সে সময় খুব টেনশন গেছে, বসিরহাটে খুব গোলমাল হয়েছিল, বাস বন্ধ ছিল কতদিন।

আবার ফোন করল শোভন, তিনি ফোন তুলেই বললেন, আমি একটা কাজে এসেছি, ফোন করবে না।

গরগর করে উঠেও সামলে নিল শোভন, বলল, তুমি তন্দ্রিমা বউদির কাছে চাবি রেখে গেছ?

না, কে বলল? অনুপম অবাক।

আমি তন্দ্রিমার কাছে যাচ্ছি মামা, তুমি কাল সকালেই ফিরে এসো, আমি ওকে বলছি তুমি বলেছ চাবি ওর কাছে, ওদের ফ্ল্যাটে না হয় এক রাত্তির থাকতে দিক।

তুমি হোটেলে যাও, ওখানে কেন তোমাকে থাকতে দেবে?

দেখি দেয় কি না, আমি তো তোমার কথায় যাচ্ছি। শোভন বলল।

কথা হচ্ছিল, কথা চলছিল। তিনি রাগে কাঁপছিলেন। ফোন কেটে দিয়ে তন্দ্রিমাকে ফোন করে সাবধান করলেন। তারপর সিকিউরিটির ছেলেটিকে বললেন, ঢুকতে না দিতে।

সিকিউরিটি বলল, সে ঢুকতে দেয়নি। ভাগ্নে রাস্তায় পায়চারি করছে ভবতোষ আর দুজনকে নিয়ে। ওই দুজন নাকি ভাগ্নের সঙ্গে বর্ধমান থেকেই এসেছে। কথাবার্তার ভিতরে ভাগ্নে তাই বলেছে।

কী হয়েছে? অদ্রি জিজ্ঞেস করল তিনি কথা বন্ধ করতে। তিনি মাথা নাড়লেন, কিছু না। কিন্তু কিছু। তখন শোভন আর ভবতোষ যাচ্ছে বেলগাছিয়া মোড়ের এক হোটেলের দিকে। রিকশয় তারা দুজন। শোভন বলছে, আমার বাবাটা হারামি ছিল, এই বুড়ো আরও হারামি, হারামি আর ক্যারেক্টারলেস, মা সব বলেছে, মা ছোটবেলায় ওদের বাড়ি থেকেছিল, তখন মাকে... মা বলত আর কাঁদত, মাকে নষ্ট করে বিয়ে করেনি, করলে আমি আজ আমেরিকায় থাকতাম।

ভবতোষ বলল, ক্যারেক্টারলেস যে তা সে জানে, একা থাকে কেন, চারতলার বউটা নিশ্চয়ই ওর কাছে আসে, তার স্বামী বাইরে থাকে।

যা বলেছ মাইরি, আমি বাড়াভাতে ছাই দিয়েছি, বুড়ো ঝামেলায় পড়বে।

ভবতোষ বলল, শালা আমাদের থাকার জায়গা নেই, উনি তিনটে ঘর নিয়ে অতবড় ফ্ল্যাটে একা থাকবে।

বুড়ো টেঁসে গেলে ওই ফ্ল্যাটের মালপত্তর সব ঝেড়ে দেব, তন্দিমা আর বুড়োর অভিসারে আমি কাঁটা হয়ে গিয়েছি, মা বলল, আমার ডিউটি মামাকে দেখা, ওর ছেলে মেয়েরে বলে দেব তন্দ্রিমার কথা, শালা লাগুক ক্যাঁচাল।

তখন দাঁড়ের মাঠে সেই জ্যোৎস্নাময়ী রাতে অনুপম শুনছিলেন আগের বছরের দাঙ্গার কথা। তার ক'মাস আগে বিশু মারা গেছে। কাল অশৌচ যায়নি, কিন্তু তারা দুই ভাই প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে মিলে গ্রাম পাহারা দিয়েছিল। দিনের বেলা মাইক নিয়ে প্রচার করেছিল। রাতের অন্ধকারে অদ্রির দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল বাইরের লোক। কিন্তু তারা কারা বলতে পারো জ্যাঠাবাবু? গুন্ডার দল এসেছিল জামতলা ঘাট পেরিয়ে। তারা বাংলা বোঝে না, বাংলায় কথা বলে না। একজনকে ধরে ফেলেছিল তারা। তার নাম শ্যামলাল আহির। বিহারের লোক। তাকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছিল। দোকানের তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। বোঝো জ্যাঠাবাবু, কেমন রায়েট, আগুন লাগিয়ে দিয়ে বলত মুসলমানে করেছে। আবার মুসলমানের দোকানে আগুন মুসলমানে দিয়ে বলত হিন্দু করেছে। সে একটা দিন গেছে দু-পক্ষকে ঠেকাতে হয়েছিল জ্যাঠাবাবু। তিনি অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন। কী সুন্দর করে বলছে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অদ্রিনীল সেন। তাতে যোগ দিচ্ছে তপতী, অভ্র আর মা বনতরু। তিনি উঠোন থেকে তাকিয়ে দেখলেন কারা যেন বারান্দায় বসে আছেন। তিনি স্পষ্ট দেখলেন বাবা জীবন সেন আর মাস্টার দাদু রাখাল ভট্টাচার্য। তিনি চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, এমন সুন্দর চাঁদের আলো, আমি আমার ছোটবেলায় রেখে গিয়েছিলাম এখানে, ফিরে পেয়েছি।

মা বনতরু বললেন, বাবলু তুই কি সত্যনারায়ণের পর চলে যাবি?

কী করব বুঝতে পারছি না, অনুপম-বাবলু বলল, আয় অদ্রি, সকলকে নিয়ে লুকোচুরি খেলি।

অদ্রিনীল উঠে দাঁড়াল। অভ্রনীল, তপতী, বনতরু, রিমঝিম। উঠোনের নিমগাছটির আড়াল থেকে তখন একজন বেরিয়ে এল যে তা স্পষ্ট দেখতে পেলেন অনুপম। কে? বিশু। বিশ্বনাথ। কে নেমে এল বারান্দা থেকে? রাখালবাবু। তাঁর সঙ্গে কে? জীবন সেন। এখানে সেই মেয়েটা, সুমিত্রা নেই। জ্যোৎস্না রাতে সে চুল খুলে দাঁড়িয়েছিল বাড়ির পিছনের আমবাগানে। বিশু তাঁকে ডাকল, দাদা।

তিনি বললেন, তোরা লুকিয়ে পড়, আমি খুঁজে বের করি।

অদ্রিনীল বলল, জ্যাঠা আমার ভাই যেন বড় হয়।

হবে হবে।

বিশু বলল, দাদা আমি তোমার কাছে রেখে গেছি এদের, তুমি দেখো।

অভ্রনীল বলল, আমি কবিতা ভালোবাসি, কবিতার জন্য জন্মেছি মনে হয় জ্যাঠাবাবু, মনে হওয়াটা কি ভুল?

না, না, কাল আমি তোকে নিয়ে পানিতর যাব, বিভূতিভূষণের বাড়ি।

ওদিকে একটা বিল আছে, কত পাখি সেখানে। অভ্রনীল বলল।

তোরা সব লুকো, এমন চাঁদের আলো, আমি তোদের খুঁজে বের করব...। তিনি দেখলেন নিম গাছের আড়ালে চলে গেল বিশু। বাবা আর রাখালবাবু কথা বলতে বলতে বাগানের দিকে চলে যাচ্ছেন। তপতী তার মেয়ের হাত ধরে ভিটের কোণের আমগাছটির আড়ালে গিয়ে হারিয়ে গেল। একে একে অদ্রি, বনতরু, অভ্র। উঠোন ফাঁকা হয়ে গেল। তখন হাওয়া উঠল। হু হু করা বাতাস উড়ে এল কোন সুদূর থেকে। সেই টুটুলের ব্লু রিজ মাউন্টেনের হাই উইন্ড এলাকা, বাতাসবাড়ি থেকে। জ্যোৎস্না ঢেউ হয়ে বয়ে যেতে লাগল। এখন ওদের খুঁজে বের করতে হবে এই চাঁদের আলোর ভিতরে। বাবা এই জ্যোৎস্না দিয়ে গেছেন। বাবা পেয়েছিলেন ঠাকুরদার কাছ থেকে। এই চাঁদের আলো আর এই সংসার সব নির্মাণ করেছিলেন তাঁরা। তিনি ঘুরতে ঘুরতে সংসারটিকে খুঁজতে খুঁজতে ঠিক করে নিতে লাগলেন কী করবেন। ফিরে যাবেন না থেকে যাবেন এই দাঁড়ের মাঠে?

থেকেই যাবেন। থেকে গেলেন। চতুর্দশী, পৌর্ণমাসী গেল। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ গেল। দ্বিতীয়ায় চাঁদ উঠল দুই প্রহর বাদে। সেই জ্যোৎস্না সেই বাতাস। আবার লুকোচুরি খেলা শুরু হল। এই তো বাবার রেখে যাওয়া ঘরবাড়ি জ্যোৎস্নাবাড়ি বাতাসবাড়ি, আনন্দবাড়ি। অভ্রনীল, অদ্রিনীল, রিমঝিম, তপতী, মা বনতরু সকলে জ্যোৎস্নার ভিতরে লুকিয়ে গেল। অনুপম একা। ঠিক তখনই সেই নির্মল বাতাস আর জ্যোৎস্নার ভিতরে কুয়াশা আর মেঘের মতো নেমে এল কে? মস্ত এক ছায়া। অন্ধকার। বড় বড় পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল সে। কিংকং আসছে, গডজিলা আসছে। দানব আসছে। সে খ্যানখ্যানে গলায় বলল সে, মামা এসে গেছি, বহুত চালাক ভাব নিজেকে, ভেবেছ আমি একটা গাধা, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব আর তুমি মস্তি মারবে চাঁদের আলোয়, এখন কী করবে, পেটে চাকু ঢুকে যাবে, সব তো লুকিয়ে গেছে জোছনার ভিতরে, শালা ফ্ল্যাটের চাবিটা দিয়ে তুমি এখানে থেকে যাও, আমি আমার মা-কি আউলাদ, তোমার উপর আমার রাইট আছে, চাবি না নিয়ে যাবই না, শালা এর নাম ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর, আসা কম ঝক্কি, মা ডিরেকশন দিল তো আসতে পারলাম।

অনুপম বুঝলেন তাঁর পরিত্রাণ নেই। তিনি ডেকে উঠলেন, আয় তো আমার অদ্রিনীল অভ্রনীল, রিমঝিম, আয়রে আমার লালকমল নীলকমল। আমি তোদের খুঁজে পাচ্ছি না, এই দেখে যা কে এসেছে আবার, সেই আগের বছর যেমন এসেছিল ঘর পুড়াতে অন্ধকারে।

অন্ধকার ফেটে জ্যোৎস্না ফুটে উঠতে লাগল আবার। বাতাসবাড়ির জ্যোৎস্নায় ঢেউ উঠল, ঢেউ।

অলংকরণ: সোমনাথ পাল

সমাপ্ত